অধ্যায় ৮ মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
Human Physiology : Coordination & Control

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- নিউরন
- সিন্যাপস
- মেনিনজেস
- নিউরোট্রান্সমিটার
- কর্নিয়া
- কনজাংক্টিভা
- অটোলিথ
- অ্যাম্পুলা
- হরমোন

উদ্দীপনা বা **সংবেদনা** (irritability or sensitivity) জীবের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বহিঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের অন্তঃস্থ কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার সামর্থ্যও জীবের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জীব তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতি সার্বক্ষণিক হুঁশিয়ার ও তৎপর থাকে। **জীবদেহের ভিতরে ও বাইরে সংঘটিত যেকোনো পরিবর্তন শনাক্তযোগ্য ও সাড়াদান উপযোগী হলে তাকে উদ্দীপনা** (stimuli; একবচন stimulus) **বলে**। উদ্দীপনা গ্রাহক অঙ্গ বা **রিসেপ্টর** (receptor)-এ গৃহীত হয়, স্নায়ু বা **নিউরন**-এ বাহিত হয় এবং **ইফেক্টর** (effector)-এর সাহায্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

আমরা যখন আহার করি তখন চোখ দিয়ে খাবারটি আগে দেখি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই, হাত তুলে খাবারটি মুখে পুরি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেই, চোয়ালের পেশি দিয়ে খাদ্য চিবাই, গলাধঃকরণ, পেরিস্ট্যালসিসসহ লালাক্ষরণ থেকে শুরু করে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের এনজাইম ইত্যাদি ক্ষরিত হয়। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এমন কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারে না। **বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমন্বয়** (coordination) **বলে**। প্রাণিদেহে দুটি সমন্বয়কারীতন্ত্র রয়েছে: একটি **ভৌত সমন্বয়তন্ত্র** যা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ঘটে, অন্যটি **রাসায়নিক সমন্বয়তন্ত্র** যা অন্তঃক্ষরাতন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ অধ্যায়ে মানবদেহে সংঘটিত বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের গঠন এবং সেগুলোর কর্ম কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা
- মস্তিষ্কের প্রধান ভাগের কাজ
- মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা
- মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্কের তুলনা
- রাসায়নিক সমন্বয়
- মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
- দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	স্নায়বিক সমন্বয়
পাঠ ২	মস্তিষ্ক : গঠন, অংশ ও কাজ
পাঠ ৩	করোটিক স্নায়ু : উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ
পাঠ ৪	মানব সংবেদী অঙ্গ : চোখ (গঠন)
পাঠ ৫	চোখের আনুষঙ্গিক অংশ
পাঠ ৬	প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন কৌশল
পাঠ ৭	মানব সংবেদী অঙ্গ : কান (গঠন)
পাঠ ৮	মানব কর্ণের ক্রিয়া কৌশল
পাঠ ৯	রাসায়নিক সমন্বয়
পাঠ ১০	মানুষের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
পাঠ ১১	হরমোনের প্রভাব
পাঠ ১২	অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

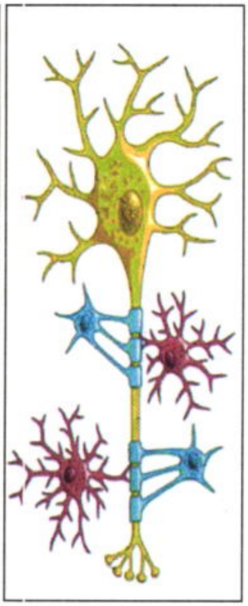

স্নায়বিক সমন্বয় (Nervous Coordination)

উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের গতিপথে এককোষী জীব যখন এক সময় বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে তখন দেহের সবখানে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অগণিত কোষের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশে আবির্ভূত হয়েছে দ্রুত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী **স্নায়ুতন্ত্র**। স্নায়ুতন্ত্র এমন এক বিশেষ অঙ্গতন্ত্র যা দেহের অন্যসব অঙ্গতন্ত্রের কাজে অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহকে পরিচালিত করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র উৎপত্তি লাভ করে। MAT(03-04)

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Nervous System) Reading

প্রাণিদেহে স্নায়ুতন্ত্র নিচের কাজগুলো সম্পাদন করে :

১. **উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান :** বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশ সম্পর্কে প্রাণীকে অবহিত করে এবং তার ভিত্তিতে প্রাণিদেহে যথাযথ পরিবর্তন ঘটিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে।

২. **কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন :** দেহের বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, তন্ত্র ও অঙ্গের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখে এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৩. **দেহের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা :** দেহের সেনসরি (সংবেদী) ও মোটর (চেষ্টীয়) অঞ্চলসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের সাম্যাবস্থা (হোমিওস্ট্যাসিস) বজায় রাখে।

৪. **সংবেদী অঙ্গসমূহ কার্যকর করা :** স্নায়ু উদ্দীপনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিচালনা করে সংবেদী অঙ্গগুলো কার্যকর রাখে।

৫. **তথ্য সংরক্ষণ :** বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাণীর আচরণকে পরিবর্তিত করে।

৬. **বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া :** স্নায়ুতন্ত্রের অংশবিশেষ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণ গ্রহণ, অনুভূতি গ্রহণ, বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন (Structure of Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক একক দুধরনের– **নিউরন** এবং **নিউরোগ্লিয়া**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. নিউরন (Neuron)

মানুষের স্নায়বিক সমন্বয়ের প্রধান সমন্বয়কারী **স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকর একককে নিউরন** বলে।

দুটি প্রধান অংশ নিয়ে প্রতিটি নিউরন গঠিত– (ক) **কোষ দেহ** (cell body) বা **সোমা** (soma) এবং (খ) **প্রলম্বিত অংশ** বা **নিউরাইট** (neurite)।

ক. **কোষ দেহ (Cell body) :** এটি নিউরনের প্রধান অংশ এবং গোল, ডিম্বাকার, নক্ষত্রাকার, মোচাকার, সুঁচালো প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হয়। কোষদেহের ব্যাস ৫ থেকে ১২০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোষদেহ প্লাজমামেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস–এ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমে প্রচুর অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং মুক্ত পলিরাইবোজোম মিলে **নিস্‌ল দানা** (Nissl's granule) গঠন করে। এছাড়া এতে বহুসংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি, গুচ্ছবদ্ধ নিউরোফিলামেন্টসহ অন্যান্য পদার্থ থাকে।

খ. **প্রলম্বিত অংশ বা নিউরাইট (Neurite) :** কোষদেহ থেকে বহির্গত শাখা-প্রশাখাকে **প্রলম্বিত অংশ** বলে। এটি দুধরনের– **ডেনড্রাইট** এবং **অ্যাক্সন**।

১. ডেনড্রাইট (Dendrite) : কোষদেহের চারদিক থেকে সৃষ্ট শাখান্বিত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে **ডেনড্রাইট** বলে। এগুলো উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পৌঁছে দেয়। ডেনড্রাইটের মধ্যে রাইবোজোম, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউরোফিলামেন্ট ইত্যাদি বিস্তৃত থাকে।

২. অ্যাক্সন (Axon) : কোষদেহের নিস্‌ল দানাবিহীন এলাকা (axon hillock) থেকে যে দীর্ঘাকার নিউরাইটটি উৎপন্ন হয় তাকে **অ্যাক্সন** বলে। অ্যাক্সনের মধ্যে মাইক্রোটিউবিউল, নিউরোফিলামেন্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজোম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে। অ্যাক্সন একটি অথবা দুটি আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে এবং তখন এর নাম হয় **স্নায়ুতন্তু** (nerve fibre)। চাপা **সোয়ান কোষ** (schwann cell) নির্মিত **নিউরিলেমা** (neurilemma) নামক একটি আবরণীতে অ্যাক্সন বেষ্টিত থাকে। অ্যাক্সন এবং নিউরিলেমার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত প্রোটিন ও ফ্যাট নির্মিত দ্বিতীয় আবরণীর নাম **মায়েলিন সিথ** (myelin sheath) আবরণ। বিভিন্ন স্থানে নিউরিলেমা অ্যাক্সনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে চলে আসে। এখানে মায়েলিন সিথ থাকে না এবং একে **র‍্যানভিয়ার-এর পর্ব** (node of ranvier) বলে। অনেক সময় অ্যাক্সনের পার্শ্বদেশ থেকে যে শাখা বের হয় সেগুলোকে **কোল্যাটেরাল শাখা** (colateral branch) এবং সাধারণত অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত বিভক্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সৃষ্টি করে সেগুলোকে **টেলোডেনড্রিয়া** (telodendria, এক বচনে telodendrion) বলে। টেলোডেনড্রিয়ার শেষ প্রান্তের স্ফীত অংশের নাম **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob)। অ্যাক্সন লম্বায় ১ মিটারের বেশি হতে পারে। সমস্ত দীর্ঘ স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে **স্নায়ু** (nerve) বলে।

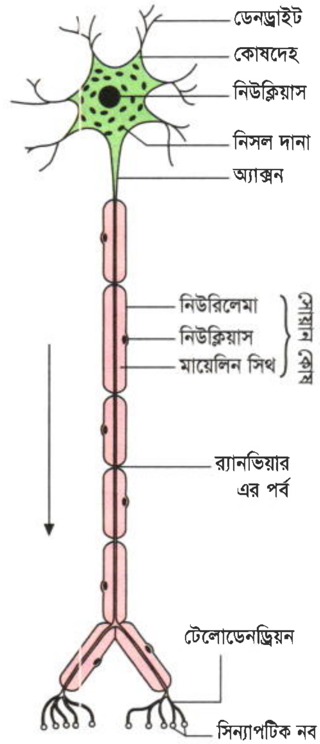

চিত্র ৮.১ : একটি নিউরন

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য		
তুলনীয় বিষয়	**অ্যাক্সন**	**ডেনড্রাইট**
১. প্রত্যেক স্নায়ু কোষে সংখ্যা	সাধারণত একটি স্নায়ুকোষে একটি থাকে।	এক বা একাধিক, কখনো নেই।
২. দৈর্ঘ্য	লম্বা (০.২৫–১০ মিমি), সমব্যাস সম্পন্ন।	খাটো (১.৫ মিমি এর কম) প্রান্তের দিকে ক্রমশ সরু।
৩. আবরণ	মায়েলিন আবরণে আবৃত।	আবরণ নেই।
৪. প্রকৃতি	চেষ্টীয়; অর্থাৎ কোষদেহ থেকে দূরে উদ্দীপনা পরিবহন করে।	সংবেদী; অর্থাৎ দূর থেকে কোষদেহে উদ্দীপনা পরিবহন করে।
৫. প্রান্তভাগ	প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে।	প্রান্তভাগে নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল থাকে না।
৬. শাখা-প্রশাখা	সাধারণত অশাখ; শাখান্বিত হলে সংখ্যায় কম ও দূরে বিস্তৃত।	সধারণত শাখান্বিত ও নিকট বিস্তৃত।
৭. র‍্যানভিয়ার-এর পর্ব	থাকে।	থাকে না।

নিউরনের প্রকারভেদ

নিম্নোক্তভাবে নিউরনের প্রকারভেদ করা যায়−

নিউরন

ক. প্রলম্বিত অংশের সংখ্যা	খ. কাজের প্রকৃতি	গ. সংবেদন পরিবহন
১. একমেরুযুক্ত	১. সংবেদী	১. অন্তর্মুখী
২. দ্বিমেরুযুক্ত	২. চেষ্টীয়	২. বহির্মুখী
৩. ছদ্মমেরুযুক্ত	৩. মিশ্র	৩. আন্তঃনিউরন
৪. বহুমেরুযুক্ত		
৫. মেরুহীন		

ক. প্রলম্বিত অংশের বা প্রবর্ধকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরন পাঁচ ধরনের :

১. **ইউনিপোলার (Unipolar) বা একমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহ থেকে একটি মাত্র প্রলম্বিত অংশ সৃষ্টি হয়, পরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি ডেনড্রাইটে ও অন্যটি অ্যাক্সনে পরিণত হয়। মেরুদন্ডী প্রাণির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে এ নিউরন থাকে। এগুলো প্রধানত সেনসরি (সংবেদী)।

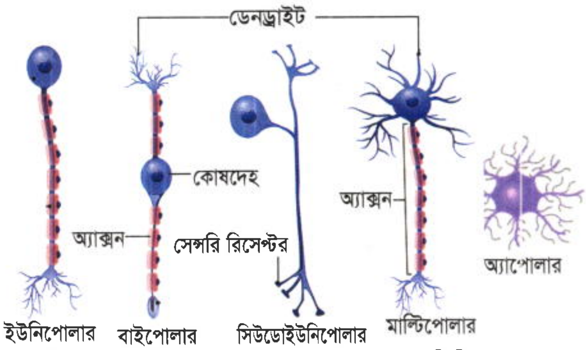

চিত্র ৮.২ : নিউরন (প্রলম্বিত অংশের সংখ্যার ভিত্তিতে)

২. **বাইপোলার (Bipolar) বা দ্বিমেরুযুক্ত নিউরন:** কোষদেহ থেকে সৃষ্ট প্রলম্বিত অংশের সংখ্যা ২টি: একটি ডেনড্রাইট, অন্যটি অ্যাক্সন। মানব ভ্রূণে স্নায়ুতন্ত্রের সব কোষই বাইপোলার। পরবর্তীকালে এগুলো ইউনিপোলার অথবা মাল্টিপোলার নিউরনে পরিণত হয়। রেটিনা, কক্লিয়া ও নাকে এ ধরনের নিউরন পাওয়া যায়।

৩. **সিউডোইউনিপোলার (Pseudounipolar) বা ছদ্মমেরুযুক্ত নিউরন** : প্রাথমিক অবস্থায় দুটি প্রলম্বিত অংশ থাকে যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মিলিত হয়ে একটিতে পরিণত হয়। দেখতে ইউনিপোলার হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো বাইপোলার নিউরন থেকে সৃষ্ট। স্পাইনাল গ্যাংলিয়া ও করোটিক স্নায়ুর গ্যাংলিয়ায় এ ধরনের নিউরন অবস্থিত।

৪. **মাল্টিপোলার (Multipolar) বা বহুমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহে অনেক প্রলম্বিত অংশ থাকে। এগুলোর একটি অ্যাক্সন ও অন্যগুলো ড্রেনড্রাইট। স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে এসব নিউরন থাকে।

৫. **অ্যাপোলার (Apolar) বা মেরুহীন নিউরন** : কোষদেহে কোন প্রলম্বিত অংশ থাকে না। সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের বহিঃস্তরে এবং চোখের রেটিনার মধ্যবর্তী নিউক্লিয়ার স্তরে মেরুবিহীন নিউরন পাওয়া যায়।

খ. কাজের প্রকৃতি অনুসারে নিউরন তিন ধরনের: (Reading)

১. **সংবেদী/সংজ্ঞাবহ (Sensory)** : দেহের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাহক অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে।

২. **চেষ্টীয়/আজ্ঞাবহ (Motor)** : এসব নিউরন স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহন করে।

৩. **মিশ্র (Mixed) বা সমন্বয়ক (Adjustor)** : এসব নিউরনের সংবেদী ও চেষ্টীয় দুধরনের স্নায়ুতন্তুই আছে। এগুলো নিউরনের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

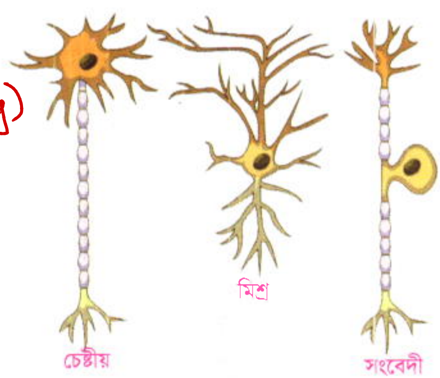

চিত্র ৮.৩ : তিন ধরনের নিউরন (কাজের ভিত্তিতে)

সংবেদন পরিবহনের দিক অনুসারে নিউরন তিন ধরনের: (Reading)

১. **অন্তর্মুখী নিউরন (Afferent neuron)** : এসব নিউরনের সংবেদন পরিবহন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দিকে। যেমন: সংবেদী/সংজ্ঞাবহ (sensory)।

২. **বহিঃমুখী নিউরন (Efferent neuron)** : এসব নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহন করে। যেমন: চেষ্টীয়/আজ্ঞাবহ (motor) নিউরন।

৩. **আন্তঃনিউরন (Inter neuron)** : এসব নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশের নিউরনগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন: মিশ্র/সমন্বয়ক (mixed/adjustor)।

২. নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia)

নিউরন যে যোজক টিস্যুর ভিতর সুরক্ষিত থাকে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরোগ্লিয়াগুলো কখনো উদ্দীপ্ত হয় না। আকার, আয়তন ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরোগ্লিয়া কোষগুলোকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **অ্যাস্ট্রোসাইট (Astrocytes)** : এ কোষগুলো তারকাকার এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত অসংখ্য সাইটোপ্লাজমিক অভিক্ষেপযুক্ত। অভিক্ষেপ দিয়ে এগুলো একদিকে রক্তজালিকা এবং অন্যদিকে নিউরনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে।

২. **অলিগোডেনড্রোসাইট (Oligodendrocytes)** : এ কোষগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম অভিক্ষেপযুক্ত। এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণ গঠন করে।

৩. **মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia)** : ক্ষুদ্রতম নিউরোগ্লিয়া। এগুলোর দেহে অসংখ্য লম্বা, সরু ও জটিল আঁকাবাঁকা ধরনের অভিক্ষেপ থাকে। এদের উৎপত্তি হয় রক্ত থেকে। এগুলো গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।

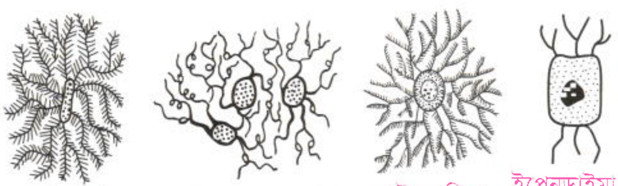

চিত্র ৮.৪ : বিভিন্ন প্রকার নিউরোগ্লিয়া কোষ

৪. **ইপেনডাইমা (Ependyma)** : এসব কোষ মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড-এর তরলপূর্ণ গহ্বরের প্রাচীর তৈরি করে। এরা এক ধরনের ঘনতলীয় আবরণী কোষ (cuboidal epithelium)। সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (cerebrospinal fluid) উৎপন্ন, সংবহন ও শোষণের সাথে এসব কোষ জড়িত।

সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরনে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণত একটি নিউরনের অ্যাক্সন-প্রান্ত অন্য নিউরনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। এভাবে, **দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন শুরু হয়, তাকে সিন্যাপস বলে।** স্নায়ু উদ্দীপনা সিন্যাপসের মাধ্যমে কেবল একদিকে (এক নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহে) পরিবাহিত হয়।

প্রত্যেক অ্যাক্সন শাখার যে অংশ এ বিশেষ সংযোগ সৃষ্টি করে তাকে বলে **সিন্যাপটিক টার্মিনাল** (synaptic terminal)। সিন্যাপসেই নিউরন থেকে অন্যান্য কোষে তথ্য প্রেরীত হয়। দুটি নিউরনকে পৃথককারী অংশ (২০–৩০ ন্যানোমিটার ফাঁক) হচ্ছে **সিন্যাপটিক ক্লেফট** বা **ফাঁক** (synaptic cleft)। যে নিউরন সংকেত পাঠায় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** (presynaptic/transmitting neuron), আর যে নিউরন সংকেত গ্রহণ করে তাকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** (postsynaptic/receiving neuron) বলে। সিন্যাপস দুধরনের, **বৈদ্যুতিক** ও **রাসায়নিক**। যে সিন্যাপসের গ্যাপ জংশনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে সরাসরি প্রবাহিত হতে পারে সেটি **বৈদ্যুতিক সিন্যাপস** (electrical synapse)। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সিন্যাপস পাওয়া যায়। সিন্যাপসের

বেশিরভাগই রাসায়নিক সিন্যাপস যা নির্দিষ্ট কোষে তথ্য স্থানান্তরের জন্য প্রিসিন্যাপটিক নিউরন থেকে উৎপন্ন একটি নিউরোট্রান্সমিটারের মুক্তির উপর নির্ভর করে।

সিন্যাপসের প্রকারভেদ : সিন্যাপস চার ধরনের যথা–

১. অ্যাক্সোসোমাটিক সিন্যাপস (Axosomatic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখাপ্রান্তগুলো অন্য নিউরনের সোমা বা কোষদেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

২. অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক সিন্যাপস (Axodendritic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখাপ্রান্তগুলো অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

৩. অ্যাক্সোঅ্যাক্সোনিক সিন্যাপস (Axoaxonic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখাপ্রান্তগুলো অন্য নিউরনের অ্যাক্সনের শাখাপ্রান্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

৪. ডেনড্রোডেনড্রাইট্রিক সিন্যাপস (Dendrodendritic synapse) : এ ধরনের সিন্যাপসে একটি নিউরনের ডেনড্রাইট অংশ অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

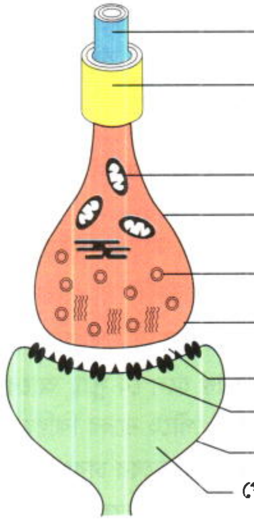

চিত্র ৮.৫ : সিন্যাপস এর গঠন

সিন্যাপস-এর কাজ : (i) নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর করে (প্রধান কাজ)। (ii) স্নায়ু উদ্দীপনাকে কেবল একদিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। (iii) বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়। (iv) অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়। (v) প্রচন্ড স্নায়ু উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অতি উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়, ফলে কার্যকর (effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

নিউরন নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু

নিচে বর্ণিত রাসায়নিক বস্তুসমূহ নিউরন থেকে নিঃসৃত হয়–

১. নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitter) : নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক বার্তাবাহক যা সিন্যাপসে প্রিসিন্যাপটিক নিউরন থেকে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনে তথ্য বহন করে। তথ্য স্থানান্তরের এ প্রক্রিয়াকে **নিউরোট্রান্সমিশন** (neurotransmission) বলে। বিশ্রামরত অবস্থায় প্রিসিন্যাপটিক নিউরন প্রত্যেক সিন্যাপটিক টার্মিনালে নিউরোট্রান্সমিটার সংশ্লেষ করে এবং একাধিক ঝিল্লি-ঘেরা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে। এর নাম **সিন্যাপটিক ভেসিকল** (synaptic vesicle)।

নিউরোট্রান্সমিটারের প্রকার : Reading

রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে নিউরোট্রান্সমিটারের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

অ্যামিনো এসিড : γ-অ্যামিনোবিউটাইরিক এসিড (GABA), অ্যাসপার্টেট, গ্লুটামেট, গ্লাইসিন, টরিন।

বায়োজেনিক অ্যামাইন : অ্যাসিটাইলকোলিন, ডোপামিন, হিস্টামিন, এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, সেরোটোনিন।

ট্রেস অ্যামাইনস : অক্টোপামাইন, ফেনাইটাইলেমাইন, ট্রিপরামিন।

পেপটাইডস : β-এন্ডোরফিন, সাবস্টেন্স-P, অপফেটামিন, সোমাটোস্ট্যাটিন, এনেকফালিন, কোলেসিস্টোকাইনিন।

পিউরিন : এডিনোসিন, এডিনোসিন ট্রাইফসফেট (এটিপি)।

গ্যাস : কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রিক অক্সাইড।

একক আয়ন : দস্তা

কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে নিউরোট্রান্সমিটারের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

উত্তেজক : অ্যাসপার্টেট, গ্লুটামেট, সেরোটোনিন, ATP, CO

বাধাদায়ক : GABA, গ্লাইসিন, টরিন।

উত্তেজনক ও বাধাদায়ক : অ্যাসিটাইলকোলিন, ডোপামিন, এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, NO, এনকেফালিন, কোলেসিস্টোকাইনিন।

২. নিউরোহরমোন (Neurohormone) : যখন কোনো রাসায়নিক দ্রব্য নিউরন থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে হরমোনের মতো কাজ করে তখন সেসব রাসায়নিক দ্রব্যকে **নিউরোহরমোন** বলে।

৩. নিউরোসিক্রেশন (Neurosecretion) : যে রাসায়নিক বস্তু নিউরন থেকে উৎপন্ন বা নিঃসৃত হয়ে বহিঃকোষীয় তরল বা নির্দিষ্ট অঙ্গে মুক্ত হয় তাদের **নিউরোসিক্রেশন** বলে।

সিন্যাপসের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহন (Synaptic Transmission)

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ।

- একটি স্নায়ু উদ্দীপ্ত হলে যে **স্নায়ু আবেগ** (nerve impulse) উৎপন্ন হয় তা স্নায়ুর ভিতর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সিন্যাপটিক নবে পৌঁছে নবের ঝিল্লিকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ঝিল্লির ভেদ্যতা বেড়ে যায়।
- ভেদ্যতা বেড়ে গেলে নবের চারপাশের অর্থাৎ কোষবহিঃস্থ তরল পদার্থ থেকে Ca^{++} নবের মধ্যে ঢোকে।
- Ca^{++} নবের ভিতরকার তরলে (কোষমধ্যস্থ তরলে) অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ATP- ase (অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফাটেজ) এনজাইমকে সক্রিয় করে।
- সক্রিয় **ATP- ase** এনজাইম ATP- কে ভেঙ্গে তা থেকে জৈবশক্তি বের করে।
- এ জৈবশক্তি সিন্যাপটিক নবে অবস্থিত **অ্যাসিটাইল কোলিন** নামে রাসায়নিক প্রেরক পদার্থে পূর্ণ থলিগুলোকে বিদীর্ণ করে। ফলে অ্যাসিটাইল কোলিন বেরিয়ে পড়ে।
- অ্যাসিটাইল কোলিন সিন্যাপটিক ক্লেফ্‌ট পেরিয়ে পোস্ট-সিন্যাপটিক ঝিল্লিতে অবস্থিত রিসেপ্টরের উপর জমা হয়ে **অ্যাসিটাইল কোলিন-রিসেপ্টর** যৌগ সৃষ্টি করে।
- যৌগটি পোস্ট-সিন্যাপটিক ঝিল্লির ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে Na^+ ঝিল্লির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং K^+ ঝিল্লির বাইরে চলে আসে। অর্থাৎ Na^+ ও K^+ এর আদান-প্রদান ঘটে।
- এভাবে, ক্রমশ **ক্রিয়া বিভব** (action potential)-এর সৃষ্টি হয়। ক্রিয়া বিভব অ্যাক্সন বা কোষদেহ বরাবর প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসের একমুখী পরিবহন ধর্মের জন্য স্নায়ু প্রবাহ শুধু একদিকে অর্থাৎ নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অন্য **নিউরনে** প্রবাহিত হয়।

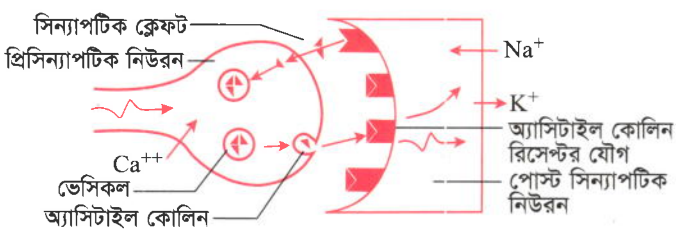

চিত্র ৮.৬ : সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

এভাবে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে ০.৫ মিলিসেকেন্ড সময় লাগে।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের প্রবাহ চিত্র নিচে দেখানো হলো–

১. স্নায়ু উদ্দীপনা → ২. বহিঃকোষীয় তরল থেকে সিন্যাপটিক নবে Ca^{2+} প্রবেশ → ৩. সিন্যাপটিক ভেসিকল → ৪. নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ (অ্যাসিটাইল কোলিন) → ৫. প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি → ৬. সিন্যাপটিক ক্লেফট → ৭. পোস্ট সিন্যাপটিক ঝিল্লিতে নিউরোট্রান্সমিটার রিসেপ্টর যৌগ তৈরি। বহিঃকোষীয় তরল থেকে Na^+ প্রবেশ এবং K^+ বের হয়ে যায়। → ৮. স্নায়ু সংকেত পরিবহন

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** ও ২. **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র**।

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System) : এটি **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত।

২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কতকগুলো স্নায়ু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এসব জোড়স্নায়ুকে **প্রান্তীয় স্নায়ু** বলে। প্রান্তীয় স্নায়ুর সমন্বয়ে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত: **ক. ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র** ও **খ. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র**।

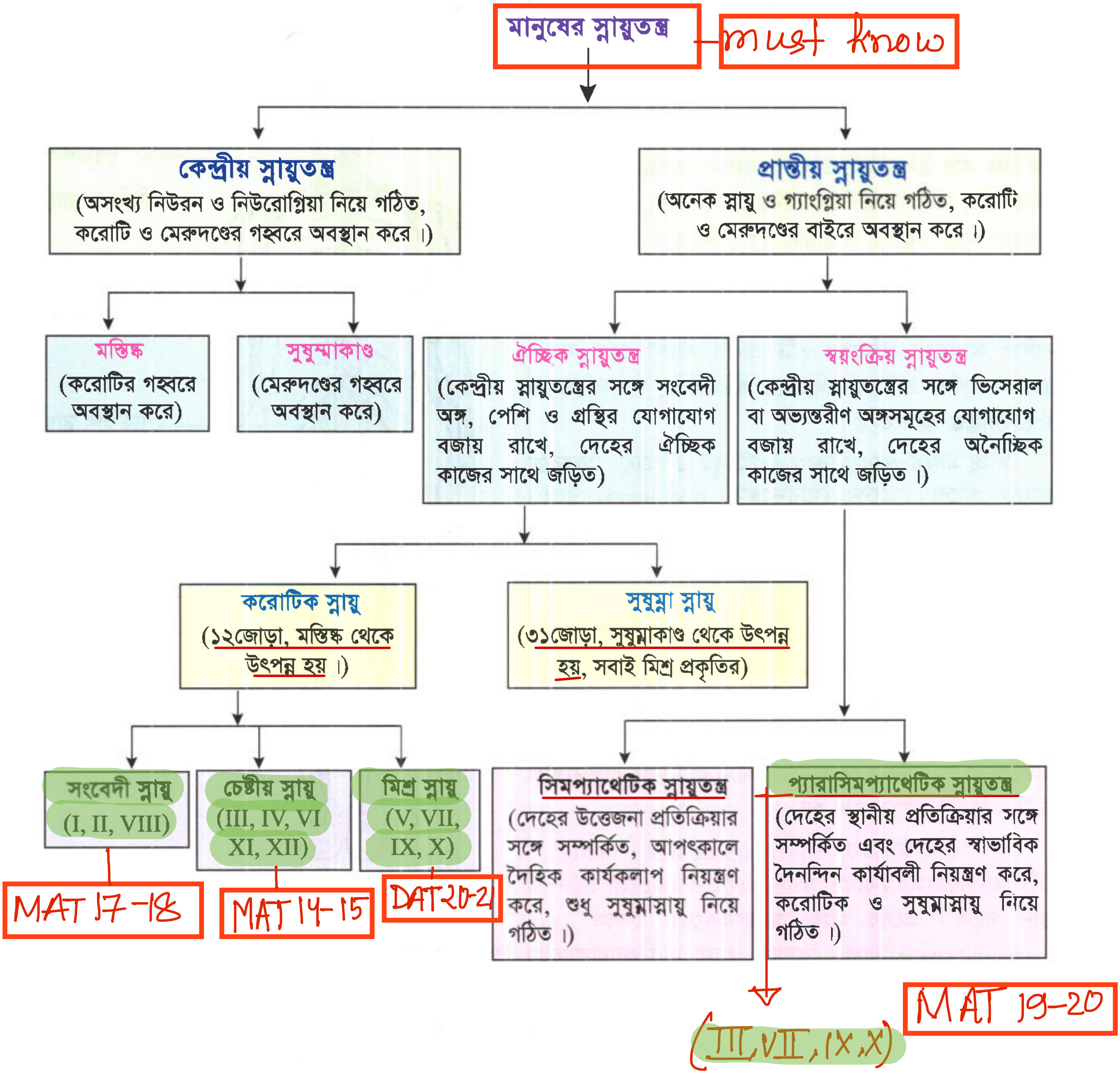

ক. ঐচ্ছিক বা **সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Voluntary or Somatic Nervous System) :** এটি ১২ জোড়া **করোটিক স্নায়ু** ও ৩১ জোড়া **সুষুম্না স্নায়ু** নিয়ে গঠিত।

খ. স্বয়ংক্রিয় বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) : এগুলো কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রধানত দেহের অনৈচ্ছিক গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ, যেমন- হৃৎস্পন্দন, পেরিস্ট্যালসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দুরকম। যথা–**সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Sympathetic Nervous System) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Parasympathetic Nervous System)।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System – CNS)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত। ভ্রূণের এক্টোডার্মের কুঞ্চনের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। **নটোকর্ড**– যা থেকে **মেরুদণ্ড** সৃষ্টি হয় ঠিক তার উপরে স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান। এক্টোডার্ম ভিতরের দিকে ভাঁজ খেয়ে একটি ফাঁপা **নিউরাল টিউব** (neural tube) দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়। নিউরাল টিউব ভ্রূণীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ফীতাকার **মস্তিষ্ক** (অগ্রভাগে) এবং একটি লম্বা দণ্ডাকার **সুষুম্নাকাণ্ড** গঠন করে। সম্মুখ নিউরাল নালির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের ৩টি ভ্রূণীয় অঞ্চল দেখা যায়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে যথাক্রমে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** ও **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** গঠন করে।

সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে। একে **মেনিনজেস** (meninges) বলে। মেনিনজেস ৩টি তন্তুময় ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। যথা- বাইরের ড্যুরা ম্যাটার, মধ্যবর্তী অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের পায়া ম্যাটার। DAT (17-18)

১. **ড্যুরা ম্যাটার (Dura mater) :** এটি মেনিনজেসের বাইরের স্তর। এতে শিরা ও সাইনাস থাকে। ড্যুরা ম্যাটার করোটিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ড্যুরা ম্যাটার দ্বিস্তরী কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডে একস্তরী। ড্যুরা ম্যাটারের বাইরের ও ভিতরের দিকে ফাঁকা স্থানকে যথাক্রমে **এপিড্যুরাল** ও **সাবড্যুরাল স্পেস** বলা হয়।

২. **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার (Arachnoid mater) :** এটি মেনিনজেসের মধ্যবর্তী ঝিল্লি। এতে কতকগুলো তরলপূর্ণ স্থান থাকে। এদের **সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস** (sub arachnoid space) বলে। কোনো কোনো সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস প্রসারিত থাকে। এদের **সিস্টারনি** (cisternae) বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রক্তনালিকাগুলো এসব স্পেসের মধ্যে বিস্তৃত থাকে।

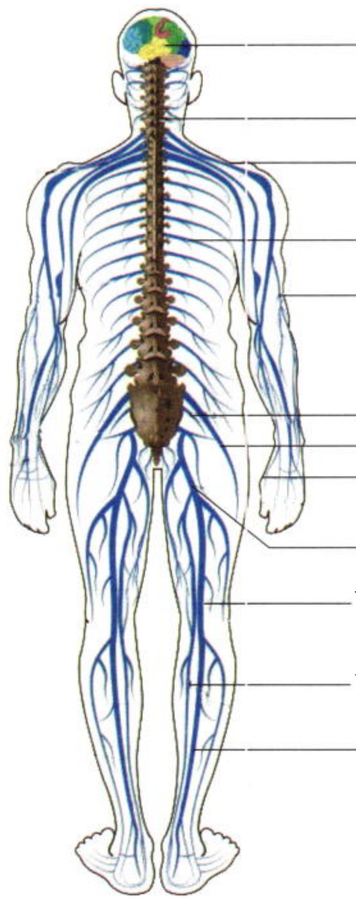

চিত্র ৮.৭ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

৩. **পায়া ম্যাটার (Pia mater) :** এটি মেনিনজেসের ভিতরের ঝিল্লি। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্তলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে।

মেনিনজেসের কাজ : (i) এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বিভিন্ন যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করে; (ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টিপদার্থ সরবরাহ করে; (iii) সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে; (iv) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

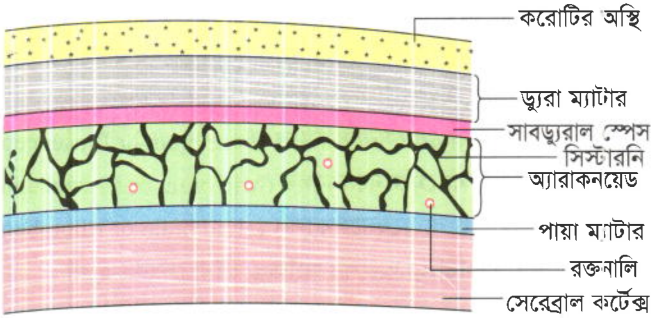

চিত্র ৮.৮ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

মেনিনজাইটিস কী : মেনিনজাইটিস (meningitis) হচ্ছে বিভিন্ন কারণে মেনিনজেসে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া। অসংক্রামক উপাদান (আঘাত, ক্যান্সার, নির্দিষ্ট ওষুধ, এক্স-রে, মস্তিষ্ক-টিউমার প্রভৃতি), এবং বিভিন্ন সংক্রমণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটিস্টা, পরজীবী জীবাণু ইত্যাদি) মেনিনজাইটিস হতে পারে। তাই ফলদায়ক চিকিৎসার জন্য রোগের নির্দিষ্ট কারণ বা উৎস জানা গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক *Neisseria meningitidis* ঘটিত ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস হচ্ছে গুরুতর। সংক্রমণে কিছু লোক মারা যায়, এমনকি এ মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস থেকে রক্ষা পেলেও কিছু স্থায়ী অক্ষমতা দেখা দিতে পারে, যেমন– মস্তিষ্কের ক্ষতি, শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং শেখার অক্ষমতা। মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলো হচ্ছে– হঠাৎ জ্বর, মাথাব্যথা, শক্ত ঘাড়, খিঁচুনী, সঙ্গে প্রায়ই অন্যান্য উপসর্গও থাকে, যেমন বমি বমি ভাব, বমি, ফটোফোবিয়া (চোখ আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল), পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা (বিভ্রান্ত) প্রভৃতি। শিশুরা হতে পারে ধীর বা নিষ্ক্রিয়, খিটখিটে, বমিভাবসম্পন্ন, ফুলে যাওয়া ফন্টানেল (শিশুর মাথায় "নরম দাগ"), অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস থেকে রক্ষা করার জন্য ভ্যাকসিন সবচেয়ে কার্যকর উপায়। মেনিনজাইটিস হতে পারে এমন ৪ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার জন্য ভ্যাকসিন রয়েছে।

মেনিনজেস ও মেনিনজাইটিসের মধ্যে পার্থক্য (Reading)		
তুলনীয় বিষয়	**মেনিনজেস**	**মেনিনজাইটিস**
১. সংজ্ঞা	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড যে দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে তাকে **মেনিনজেস** বলে।	জীবাণুতে সংক্রমিত মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে **মেনিনজাইটিস** বলে।
২. গঠন	মেনিনজেস ৩টি তন্তুময় ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। বাইরের ডুরা ম্যাটার, মাঝখানে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের পায়াম্যাটার।	মেনিনজাইটিস যেহেতু রোগ তাই এর গঠনগত ভিত্তি নেই, কিন্তু এ রোগের লক্ষণ হলো মাথা ব্যথা ও গ্রীবা শিথিল হওয়া।
৩. বৈশিষ্ট্য	মেনিনজেস সব বয়সী মানুষেরই মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের একটি স্থায়ী আবরণ।	মানুষের বয়স, সময় ও স্থায়ীত্ব নির্ভর নয়, বরং যে কোনো সময় যে কারও হতে পারে। মেনিনজেস সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় *Neisseria meningitidis* ব্যাকটেরিয়া দিয়ে।

মস্তিষ্ক : গঠন, অংশ ও কাজ (Brain : Structure, Parts and Functions)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত ও জটিল অংশ মানুষের করোটিকার (cranium) **মধ্যে সুরক্ষিত থাকে এবং দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বা এনসেফালন** (brain or encephalon) **বলে।** ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব মস্তিষ্কই সবচেয়ে জটিল। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন পুরুষের প্রায় ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩ – ১.৪ কেজি যা দেহের মোট ওজনের ২% গঠন করে। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) নিউরন থাকে। MAT (16-17)

মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক প্রধান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ মানুষে এটি আরো জটিলরূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। মানব ভ্রূণের মস্তিষ্কের গঠনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মস্তিষ্ককে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা–

১. **অগ্রমস্তিষ্ক** বা **প্রোসেনসেফালন** (Fore brain or Prosencephalon)
২. **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** (Mid brain or Mesencephalon) এবং
৩. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** বা **রম্বেনসেফালন** (Hind brain or Rhombencephalon)।

নিচে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

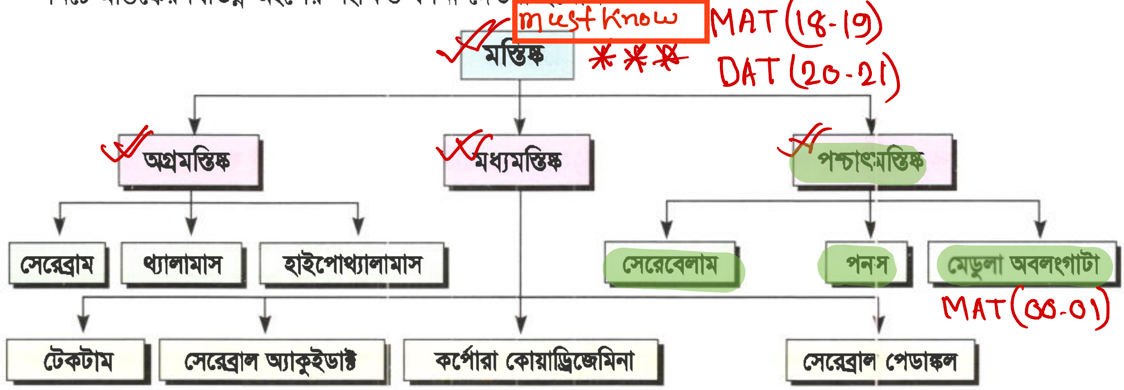

১. অগ্রমস্তিষ্ক (Prosencephalon)

অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা– **সেরেব্রাম, থ্যালামাস** ও **হাইপোথ্যালামাস**। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. সেরেব্রাম (Cerebrum) : দুটি পাশাপাশি অবস্থিত, বড়, কুন্ডলি পাকানো ও খাঁজবিশিষ্ট খন্ড নিয়ে **সেরেব্রাম** গঠিত। খন্ডদুটিকে **সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের ৮০%-ই হচ্ছে সেরেব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। হেমিস্ফিয়ার দুটি উপরিভাগে একটি গভীর অনুদৈর্ঘ্য খাঁজের মাধ্যমে পৃথক থাকলেও ভিতরের দিকে **কর্পাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামে চওড়া স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এগুলোকে **পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ** বলে।

সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বহিঃস্তর ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। এর নাম **সেরেব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অন্তঃস্তর **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত এবং **সেরেব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) নামে পরিচিত। (উল্লেখ্য যে সুষুম্নাকান্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার থাকে বাইরের দিকে, আর গ্রে ম্যাটার থাকে ভিতরের দিকে)। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশ এবং বাম হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

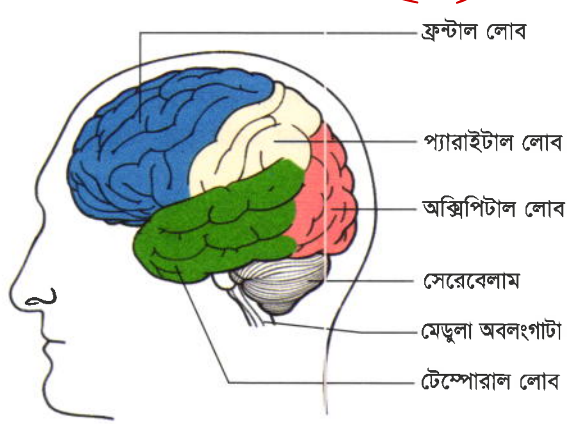

চিত্র ৮.৯ : মানব মস্তিষ্কের বাহ্যিক গঠন

সেরেব্রাল কর্টেক্সের বহির্তল কুণ্ডলিত হয়ে অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি করে। এসব ভাঁজের উঁচু স্থানগুলোকে **জাইরি** (বহুবচন-gyri, একবচন-gyrus) এবং নিচু স্থানগুলোকে **সালকি** (বহুবচন-sulci, একবচন-sulcus) বলে। এতে সেরেব্রামকে ৫টি খণ্ডে বা লোবে বিভক্ত দেখা যায়। প্রতিটি লোব এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কাজের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। লোবগুলো হচ্ছে–

i. **ফ্রন্টাল লোব (Frontal lobe)**: মানসিক বোধের (যেমন: স্মৃতি, বুদ্ধি, চিন্তা, শিক্ষা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি) কেন্দ্র ও বাক কেন্দ্র।
ii. **প্যারাইটাল লোব (Parietal lobe)** : সাধারণ অনুভূতির (যেমন: ব্যথা, স্পর্শ, উষ্ণতা ইত্যাদি) কেন্দ্র ও স্বাদ কেন্দ্র।
iii. **টেম্পোরাল লোব (Temporal lobe)** : শ্রুতি কেন্দ্র।
iv. **অক্সিপিটাল লোব (Occipital lobe)**; দৃষ্টি কেন্দ্র।
v. **লিম্বিক লোব (Limbic lobe)** : সহজাত প্রবৃত্তির (যেমন : খাদ্য গ্রহণ, রেচন, জনন ইত্যাদি) কেন্দ্র।

Grey matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ধূসর বর্ণের অংশ যা স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া ও সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।
White matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টিস্যু যা মূলত মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। মায়েলিনযুক্ত থাকার কারণে টিস্যুটিকে সাদা চকচকে দেখায়। মায়েলিন চর্বিজাতীয় পদার্থে তৈরি।

DAT (18-19)

VVI **সেরেব্রামের কাজ** : (i) সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে; (ii) চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে; (iv) বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে; (v) দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; তাই মস্তিষ্কের সেরেব্রাম অঞ্চল আঘাতপ্রাপ্ত হলে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।

খ. থ্যালামাস (Thalamus) : প্রত্যেক সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাল মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চলের নাম **থ্যালামাস**। দুটি থ্যালামাই (বহুবচন) একটি যোজক দিয়ে যুক্ত।

VVI **কাজ** : (i) এটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) **রিলে স্টেশন** হিসেবে কাজ করে (স্নায়ু আবেগ → থ্যালামাস → সেরেব্রাম); (ii) চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (iii) মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়; (iv) ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

গ. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) : এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটার নির্মিত এবং অন্ততঃ এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত। এটি **লিম্বিক সিস্টেম** (limbic system; আচরণগত ও আবেগ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করে)-এর মূল অংশ। MAT (04-05), (09-10) MAT (14-15), (24-25)

VVI **কাজ** : (i) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (ii) দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (iv) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে; (v) ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নামে দুরকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে।

২. মধ্যমস্তিষ্ক (Mesencephalon)

হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সামনে অবস্থিত ছোট ও সঙ্কুচিত অংশকে **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় গহ্বরকে ঘিরে রাখে। অঙ্কীয়দেশে এটি একটি স্নায়ুরজ্জু দিয়ে পনস ও সেরেবেলামকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্ক নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. টেকটাম (Tectum) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠীয় অংশ।

খ. সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট (Cerebral aqueduct) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের ভিতরে অবস্থিত এবং মস্তিষ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গহ্বরকে সংযুক্ত করে।

গ. কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা (Corpora quadregemina) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত।

ঘ. সেরেব্রাল পেডাঙ্কল (Cerebral peduncle) : এটি মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।

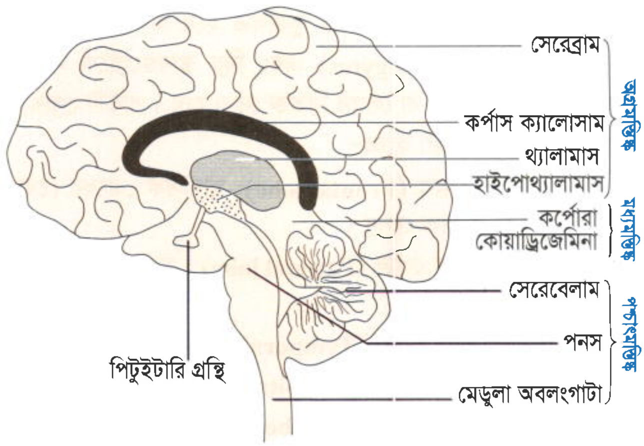

চিত্র ৮.১০ : মানব মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

কাজ : (i) এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; (ii) দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৩. পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Rhombencephalon)

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশ এবং ৩টি প্রধান অংশ দিয়ে গঠিত, যথা–**সেরেবেলাম** (cerebellum), **পনস** (pons) এবং **মেডুলা অবলংগাটা** (medulla oblongata)।

ক. সেরেবেলাম (Cerebllum) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত, কুন্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেবেলামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটার-এ এবং ভিতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার-এ গঠিত। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরেবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : (i) ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে; (ii) ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে; (iv) চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামে মধ্যে পার্থক্য

সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
১. অগ্রমস্তিষ্কের অংশ।	১. পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ।
২. অপেক্ষাকৃত বড়, মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।	২. অপেক্ষাকৃত ছোট, মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ।
৩. করোটি গহ্বরের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত।	৩. সেরেব্রামের নিচে পশ্চাৎ করোটির খাঁজে অবস্থিত।
৪. দুটি পার্শ্বীয় সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত, গোলার্ধ দুটি ফাঁপা অর্থাৎ গহ্বরযুক্ত।	৪. দুটি পার্শ্বীয় সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত, গোলার্ধ দুটি নিরেট অর্থাৎ গহ্বরবিহীন।
৫. গোলার্ধ দুটি কর্পাস ক্যালোসাম দিয়ে যুক্ত।	৫. গোলার্ধ দুটি ভার্মিস দিয়ে যুক্ত।
৬. প্রতিটি গোলার্ধ পাঁচটি লোব বা খণ্ডে বিভক্ত।	৬. গোলার্ধে এরকম কোনো লোব বা খণ্ড নেই।
৭. একদিকের গোলার্ধ দেহের বিপরীত অর্ধাংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	৭. একদিকের গোলার্ধ দেহের সেই দিকের অর্ধাংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
৮. প্রধান কাজ: বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, ভয়, ক্রোধ, চাপ, তাপ, ব্যথা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি স্নায়বিক বোধসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা।	৮. প্রধান কাজ: দেহভঙ্গি ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা।

খ. পনস (Pons) : এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত সেরেবেলামের অঙ্কীয়দেশে মেডুলার সামনের দিকে অবস্থিত একটি স্ফীত পিণ্ডাকার গঠন। এতে বিদ্যমান পুরু স্নায়ুতন্তু সেরেবেলাম, মেডুলা ও সেরেব্রামের সাথে যুক্ত থাকে। পনসের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে একে অপরকে অতিক্রম করে। এ আড়াআড়ি অতিক্রমের কারণে **মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।**

কাজ : (i) এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্র (reflex center) হিসেবে কাজ করে; (ii) শ্বসন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চালন পথ হিসেবে কাজ করে; (iv) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

গ. মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) বা মেডুলা (Medulla) : এটি পনস-এর নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দন্ডাকার অংশ যা লম্বায় প্রায় ৩ সেমি. চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.।

কাজ : (i) হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সঙ্কোচন, লালাক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; (ii) বমন, মল-মূত্রত্যাগ, রক্তচাপ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে; (iii) সুষুম্নাকান্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে; (iv) মেডুলা অবলংগাটা IX, X, XI ও XII নং করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

মধ্যমস্তিষ্ক, পনস ও মেডুলা অবলংগাটাকে একত্রে **ব্রেইন স্টেম** (brain stem) বলে।

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল / গহ্বর / প্রকোষ্ঠ (Ventricles of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তরে **তরলপূর্ণ গহ্বর** থাকে। গহ্বরগুলোকে **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বলে। মানুষের মস্তিষ্কে ৪টি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়। এগুলো ২টি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল নামে পরিচিত। নিচে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

- **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল (Lateral ventricles):** অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ভেন্ট্রিকল দুটিকে **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে।
- **তৃতীয় ভেন্ট্রিকল (Third ventricle) :** অগ্রমস্তিষ্কের দুটি থ্যালামাসের মধ্যবর্তী গহ্বরকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। **ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা ফোরামেন অব মনরো** (foramen of monro) **দ্বারা** এটি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল দুটির সাথে যুক্ত থাকে।
- **চতুর্থ ভেন্ট্রিকল (Fourth ventricle) :** এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে। **অ্যাকুইডাক্ট অব সিলভিয়াস** (aqueduct of silvius)-এর মাধ্যমে এটি তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

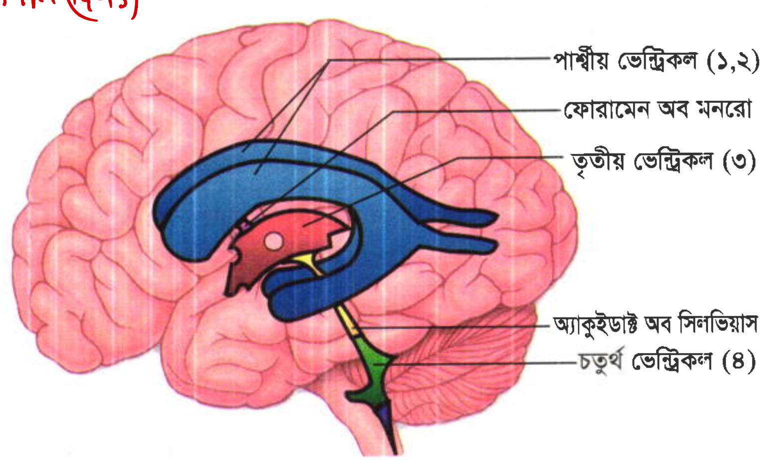

চিত্র ৮.১১ : মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকলসমূহ

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebrospinal Fluid)

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল, সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি, সাব-অ্যারাকনয়েড স্থানের মধ্যে অবস্থিত এক প্রকার স্বচ্ছ, বর্ণহীন, মরিবর্তনীয় টিস্যুরসকে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা মস্তিষ্ক মেরুরস বলে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) মূলত মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল-এর কোরয়েড জালিকা থেকে তৈরি হয়। কিছু পরিমাণ CSF ইপেনডাইমাল কোষ থেকেও ক্ষরিত হয়। মেনিনজেসও এ ফ্লুইড ক্ষরণ করে থাকে।

RMDAC

এটি পানির মতো স্বচ্ছ তবে এতে কিছু লিম্ফোসাইট কোষ থাকে। এটি মৃদু ক্ষারধর্মী (pH ৭.৩৩) এবং এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৪ – ১.০০৬। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে এর পরিমাণ প্রায় ১৪০–১৫০ মিলিলিটার। দৈনন্দিন ক্ষরণের পরিমাণ ৫০০ মিলি। এতে প্লাজমায় অবস্থিত সব উপাদানই থাকে। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়।

কাজ : (i) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানে অবস্থানের জন্য এটি যান্ত্রিক চাপের সমতা বজায় রাখে। (ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন বিপাকজাত পদার্থ অপসারণ করে। (iii) স্নায়ুকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। (iv) মস্তিষ্ককে ভাসিয়ে রেখে এর প্রকৃত ওজন ১৫০০ গ্রাম থেকে ৫০ গ্রাম-এ হ্রাস করে। (v) এতে অবস্থিত শ্বেতকণিকা স্নায়ুতন্ত্রকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

Reading

ভ্রূণীয় মস্তিষ্ক	প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	সেরেব্রাম	দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, কথন, স্পর্শানুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	থ্যালামাস	গন্ধ ছাড়া অন্যান্য সংবেদী উপাত্তকে সমন্বিত করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে; স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।
	হাইপোথ্যালামাস	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু এবং দেহের আন্তঃসাম্য রক্ষা করে; পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; ক্রোধ, ভীতি, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক, চলন ও নিদ্রার ছন্দ এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানসিক ও দৈহিক কাজের সমন্বয় সাধন করে।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; এবং বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরেবেলাম	দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে; পেশির টান ও দেহভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সব ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে; হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, শ্বসন, চর্বণ, খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাকরস ক্ষরণ, ঘাম নিঃসরণ ইত্যাদি ঘটায়। পৌষ্টিকনালির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তনালির সঙ্কোচন- প্রসারণ, লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের করোটিক স্নায়ু (Human Cranial Nerves)

যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় সেগুলোকে করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের মস্তিষ্কে **বারো জোড়া** করোটিক স্নায়ু আছে। সম্মুখ অংশ থেকে পরপর এদের **রোমান সংখ্যা** (I–XII) দিয়ে সূচিত করা হয়। জোড়া স্নায়ুর প্রত্যেক পাশের অনুরূপ অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। **কাজের প্রকৃতিভেদে করোটিক স্নায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–**

১. সংবেদী স্নায়ু (Sensory nerve) : যেসব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদী বা সংবেদী অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় সেসব স্নায়ুকে **সংবেদী স্নায়ু** বলে। এ ধরনের স্নায়ু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-**অন্তর্বাহী, সংজ্ঞাবাহী, অনুভূতিবাহী** ইত্যাদি।

২. চেষ্টীয় স্নায়ু (Motor nerve) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে যেসব স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেগুলোকে **চেষ্টীয় স্নায়ু** বলে। এগুলো **বহির্বাহী, আজ্ঞাবাহী** ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

৩. মিশ্র স্নায়ু (Mixed nerve) : যেসব স্নায়ুর এক বা একাধিক গুচ্ছ সংবেদী স্নায়ু এবং এক বা একাধিক গুচ্ছ চেষ্টীয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত সেসব স্নায়ুকে **মিশ্র স্নায়ু** বলে। এগুলো সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে।

মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর বর্ণনা নিম্নরূপ।

I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory) স্নায়ু : অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ) থেকে সৃষ্টি হয়ে নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো **সংবেদী স্নায়ু** এবং মস্তিষ্কে **ঘ্রাণ** উদ্দীপনা বহন করে।

II. অপটিক (Optic) স্নায়ু : অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ) থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর ডান ও বাম অপটিক স্নায়ুদুটি পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে ছেদ ও অতিক্রম করার মাধ্যমে ইংরেজি "X" আকৃতির **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) গঠন করে। এরপর চোখে প্রবেশ করে রেটিনায় বিস্তৃত হয়। এগুলো **সংবেদী স্নায়ু**। চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।

III. অকুলোমোটর (Oculomotor) স্নায়ু : মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের ইনফিরিয়র অবলিক ও তিনটি রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো **চেষ্টীয় স্নায়ু**। চক্ষুপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear) স্নায়ু (প্যাথেটিক স্নায়ু) : মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে **সুপিরিয়র অবলিক** নামক চক্ষুপেশিতে বিস্তার লাভ করে। এগুলোও **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal) স্নায়ু : পনসের পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

ক. অপথ্যালমিক (Ophthalmic) : সবচেয়ে ছোট এ শাখাটি ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক এবং নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটি **সংবেদী** প্রকৃতির এবং উল্লেখিত অংশ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

খ. ম্যাক্সিলারি (Maxillary) : এ শাখা নিম্ন অক্ষিপল্লব, ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ও ঊর্ধ্ব চোয়ালের মিউকাসঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও **সংবেদী স্নায়ু** এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

গ. ম্যান্ডিবুলার (Mandibular) : মিশ্র এ স্নায়ু নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। নিম্নচোয়ালের পেশি ও চামড়ায় অনুভূতি বহন করে কিন্তু মুখবিবরের পেশিতে **চেষ্টীয় স্নায়ু**রূপে কাজ করে।

VI. অ্যাবডুসেন্স (Abducens) স্নায়ু : পনস ও মেডুলা অবলংগাটার (মেডুলা) সংযোগস্থলের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অক্ষিগোলকের **বহিঃরেকটাস** পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

VII. ফ্যাসিয়াল (Facial) স্নায়ু : ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক পিছনে পনস ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগস্থলের পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এটি **মিশ্র প্রকৃতির** স্নায়ু। উৎপত্তির পর এ স্নায়ু দুটি শাখায় ভাগ হয়। যথা–

ক. প্যালাটাইন (Palatine) : এর শাখা (সংবেদী) মুখবিবরের ছাদে বিস্তার লাভ করে এবং স্বাদ গ্রহণে কাজ করে।

খ. হায়োম্যান্ডিবুলার (Hyomandibular) : এ শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কানের পর্দা, নিম্নচোয়ালের সংযোগস্থল, মুখবিবরের তলদেশের **মিউকাস ঝিল্লি** ও পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি একটি **মিশ্র স্নায়ু**। আস্বাদন, মুখের অভিব্যক্তি এবং গ্রীবাপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ। MAT 18-19

VIII. ভেস্টিব্যুলোকক্লিয়ার বা অডিটরি (Vestibulocochlear or Auditory) স্নায়ু : ফ্যাসিয়াল স্নায়ুর পশ্চাৎভাগে পনস ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগস্থলের পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এটি **সংবেদী** প্রকৃতির এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

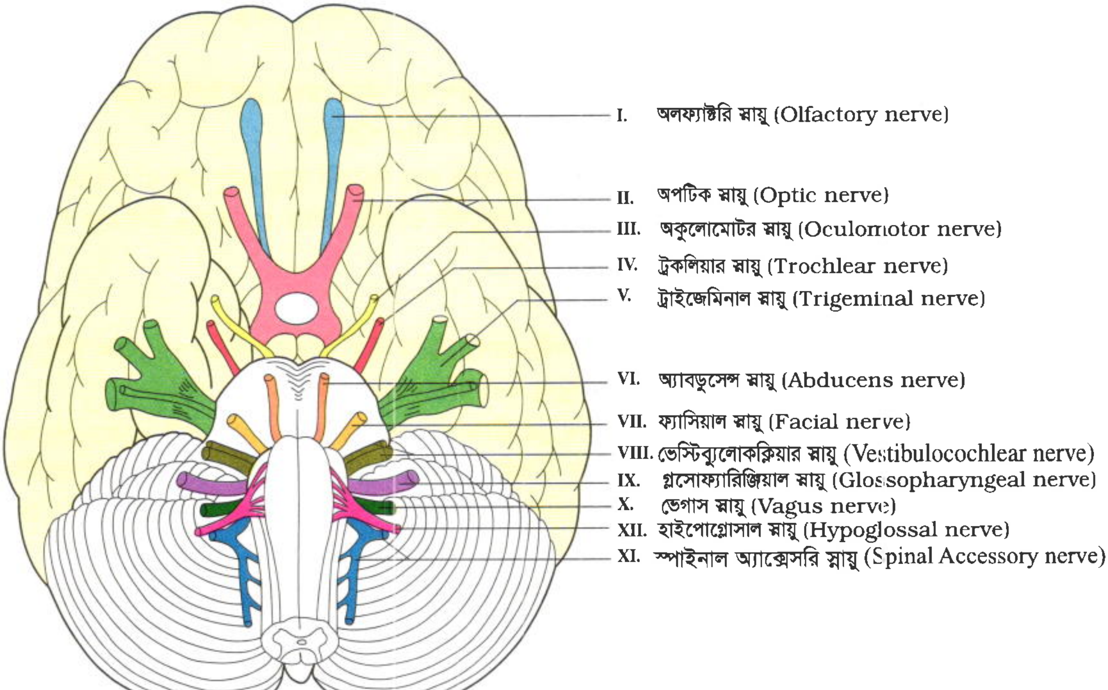

চিত্র ৮.১২ : মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি

IX. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glossopharyngeal) স্নায়ু : অডিটরি স্নায়ুর পিছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এ স্নায়ু জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস ঝিল্লিসহ গলবিলের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি **মিশ্র স্নায়ু**। স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

X. ভেগাস (Vagus) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি স্নায়ু চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। ভেগাস একটি **মিশ্র স্নায়ু**। শাখাগুলো সংশিষ্ট অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। শাখাগুলো হচ্ছে:

ক. ল্যারিঞ্জিয়াল (Laryngeal) : স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়।

খ. কার্ডিয়াক (Cardiac) : হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সরবরাহ করে।

গ. গ্যাস্ট্রিক (Gastric) : পাকস্থলিতে স্নায়ু প্রদান করে।

ঘ. পালমোনারি (Pulmonary) : ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে।

XI. স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি (Spinal Accessory) স্নায়ু : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র এবং গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি **চেষ্টীয় স্নায়ু** এবং গলবিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal) স্নায়ু : সর্বশেষ এ স্নায়ুজোড়া মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে জিহ্বা ও গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে। এটিও **চেষ্টীয়** প্রকৃতির স্নায়ু এবং জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

একনজরে মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	স্নায়ুর নাম	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	প্রকৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোব)	–	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	সংবেদী (sensory)	ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
II	অপটিক	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোব)	–	চোখের রেটিনা	সংবেদী	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
III	অকুলোমোটর	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	অক্ষিগোলকের পেশি, উর্ধ্ব নেত্রপল্লব উত্তোলন-কারী পেশি ও পিউপিল সঙ্কোচনকারী পেশি	চেষ্টীয় (motor)	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
IV	ট্রকলিয়ার	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	–	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
V	ট্রাইজেমিনাল	পনস-এর পার্শ্বদেশ	অপথ্যালমিক	অক্ষিপল্লব, নাসিকার মিউকাস	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যাক্সিলারি	অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যান্ডিবুলার	মুখবিবরের অঙ্কীয়-দেশের পেশি	মিশ্র (mixed)	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন।
VI	অ্যাবডুসেন্স	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের অঙ্কীয়দেশ	–	বহিঃরেক্টাস নামের চক্ষুপেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
VII	ফ্যাসিয়াল	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের পার্শ্বদেশ	প্যালাটাইন	মুখবিবরের ছাদ	সংবেদী	স্বাদ গ্রহণ।
			হায়োম্যান্ডি-বুলার	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	মিশ্র	চর্বন, গ্রীবা সঞ্চালন।
VIII	ভেস্টিব্যুলোককিয়ার বা অডিটরি	পনস ও মেডুলার সংযোগ স্থলের পার্শ্বদেশ	–	অন্তঃকর্ণ	সংবেদী	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা।
IX	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল	মেডুলার পার্শ্বদেশ	–	জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দা	মিশ্র	স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন।
X	ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)	মেডুলার পার্শ্বদেশ	ল্যারিঞ্জিয়াল	স্বরযন্ত্র	মিশ্র	স্বরযন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			কার্ডিয়াক	হৃৎপিণ্ড	মিশ্র	হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			গ্যাস্ট্রিক	পাকস্থলি	মিশ্র	পাকস্থলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			পালমোনারি	ফুসফুস	মিশ্র	ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
XI	স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি	মেডুলার পার্শ্বদেশ	–	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	চেষ্টীয়	মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন।
XII	হাইপোগ্লোসাল	মেডুলার অঙ্কীয়দেশ	–	জিহ্বা ও গ্রীবা	চেষ্টীয়	জিহ্বার বিচলন।

সংবেদী ও চেষ্টীয় স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য		
তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	সংবেদী বা সেন্সরী (Sensory) স্নায়ু	চেষ্টীয় বা মোটর (Motor) স্নায়ু
১. গঠন	সংবেদী নিউরন নিয়ে গঠিত।	চেষ্টীয় নিউরন নিয়ে গঠিত।
২. অন্য নাম	সংবেদী স্নায়ুকে **অন্তর্বাহী** বা **অ্যাফারেন্ট** স্নায়ু বলে।	চেষ্টীয় স্নায়ুকে **বহির্বাহী** বা **ইফারেন্ট** স্নায়ু বলে।
৩. অনুভূতি সংগ্রহের স্থান	প্রান্তীয় টিস্যু।	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।
৪. অনুভূতি পরিবহনের স্থান	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অনুভূতি পরিবহন করে।	প্রান্তীয় টিস্যুতে অনুভূতি পরিবহন করে।
৫. উদাহরণ	অলফ্যাক্টরি, অপটিক এবং অডিটরি স্নায়ু হচ্ছে সংবেদী করোটিক স্নায়ু।	অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অ্যাবডুসেন্স, অ্যাক্সেসরি এবং হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু হচ্ছে মটর স্নায়ু।

করোটির স্নায়ু ও সুষুম্না স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য	
করোটিক স্নায়ু (Cranial Nerves)	সুষুম্না স্নায়ু (Spinal Nerves)
১. মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।	১. সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়।
২. মানবদেহে এদের সংখ্যা ১২ জোড়া।	২. মানবদেহে এদের সংখ্যা ৩১ জোড়া।
৩. প্রত্যেকের স্নায়ুমূল ১টি।	৩. প্রত্যেকের স্নায়ুমূল ১ জোড়া।
৪. সংবেদি অথবা চেষ্টীয় অথবা মিশ্র প্রকৃতির।	৪. মিশ্র প্রকৃতির।
৫. তুলনামূলকভাবে বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নত, প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় অংশ নেয় না।	৫. তুলনামূলকভাবে কম উন্নত, অনেক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে না, সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে।
উদা: অপটিক স্নায়ু, অডিটরি স্নায়ু, ভেগাস স্নায়ু ইত্যাদি।	উদা: সারভাইক্যাল স্নায়ু, থোরাসিক স্নায়ু, লাম্বার স্নায়ু ইত্যাদি।

সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পিছনের প্রলম্বিত অংশটি **সুষুম্নাকাণ্ড**। মেডুলা অবলংগাটার নিচের অংশ থেকে উদগত হয়ে এটি **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটি বড় গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল নালির মাধ্যমে পিছনে লাম্বার কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কের মতো **মেনিনজেস** দিয়ে আবৃত থাকে। এর বাইরের আবরণকে **ডুরা ম্যাটার** এবং ভিতরের আবরণকে **পায়া ম্যাটার** বলে। উভয় পর্দার মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি পর্দাকে **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** বলে। মস্তিষ্কের মতো সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরেও গহ্বর আছে। মস্তিষ্কের গহ্বরকে **ভেন্ট্রিকল** বললেও সুষুম্নাকাণ্ডের গহ্বরকে **কেন্দ্রীয় নালি** (central canal) বলে। এ কেন্দ্রীয় নালির নিচের প্রান্তে একটু স্ফীত অংশ থাকে যা **টারমিনাল ভেন্ট্রিকল** নামে পরিচিত। গহ্বরের মধ্যে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** নামক তরল পদার্থ থাকে। কেন্দ্রীয় নালির চারদিকে নিউরনের কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং সিন্যাপসে গঠিত ইংরেজি 'H' আকৃতির বা প্রজাপতি আকৃতির **গ্রে ম্যাটার** (grey matter) অঞ্চল অবস্থিত। বস্তুত স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত হওয়ায় এমন ধূসর বর্ণের হয়। গ্রে ম্যাটার অঞ্চল **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter) অঞ্চল দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। বাইরের হোয়াইট ম্যাটার স্তরে কোন কোষবস্তু নেই, শুধু স্নায়ুসূত্র (অ্যাক্সন) রয়েছে। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া **সুষুম্না স্নায়ু** (spinal nerves) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক স্নায়ুর দুটি করে মূল থাকে, যথা- **পৃষ্ঠীয় মূল** (dorsal root) এবং **অঙ্কীয় মূল** (ventral root)। পৃষ্ঠীয় মূলে **পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংগ্লিয়া** (dorsal root ganglia) থাকে যা সংবেদী নিউরনের কোষদেহ নিয়ে গঠিত।

কাজ : সুষুম্নাকান্ড **সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত** (simple spinal reflex) সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, যেমন– হাঁটু ঝাঁকুনি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। আবার মূত্রথলির সঙ্কোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত সুষুম্নাকাণ্ডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে সুষুম্নাকাণ্ড।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

মস্তিষ্ক	সুষুম্নাকাণ্ড
১. করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে।	১. মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে।
২. স্ফীত ও ডিম্বাকৃতির।	২. লম্বা ও প্রায় চোঙ্গাকৃতির।
৩. বাইরের দিক থেকে সালকি ও গাইরি ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।	৩. বাইরের দিক থেকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।
৪. মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।	৪. সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
৫. দেহের সকল যান্ত্রিক, জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	৫. সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

মানব সংবেদী অঙ্গ (Human Sensory Organs)

প্রত্যেক জীব নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন। সতর্ক না হলে নিজের এবং নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যাবে। নিম্নতম জীব থেকে উচ্চতম জীব মানুষ পর্যন্ত সবাই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ। সংবেদন শক্তির মাধ্যমে জীব পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারে। উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সংবেদন শক্তি বেশি সুগঠিত। কারণ এদের রয়েছে উন্নত স্নায়ুতন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। সংবেদী অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগত অনুভব করতে পারি। **চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদী অঙ্গ**। সাধারণ ভাষায় এগুলো **পঞ্চ-ইন্দ্রিয়** নামে পরিচিত। উন্নত স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র, সংবেদী অঙ্গ নিয়ে মানুষ সর্বোত্তভাবে পৃথিবীর সেরা জীবের আসনে আসীন হয়েছে। নিচে মানুষের দর্শন এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গের বিবরণ দেওয়া হলো।

চোখ – দর্শনেন্দ্রিয় (Eye – Organ of Vision)

চোখ এমন এক সংবেদী অঙ্গ যা আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে।

মানুষের চোখদুটি মাথার দুপাশে বহিঃকর্ণ ও নাসারন্ধ্রের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। চোখ গোল **অক্ষিগোলক**-এ গঠিত। কয়েকটি আনুষঙ্গিক অঙ্গও চোখের সাথে জড়িত। চোখের মাত্র $\frac{১}{৬}$ অংশ বাইরে উন্মোচিত, বাকি $\frac{৫}{৬}$ অংশই কোটরের ভিতরে অবস্থান করে। চোখের পর্দায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসে চোখ সিক্ত থাকে।

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশকে **দুটি** প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–**অক্ষিগোলক** (eye ball) ও **আনুষঙ্গিক অংশ** (accessory parts)। নিচে মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

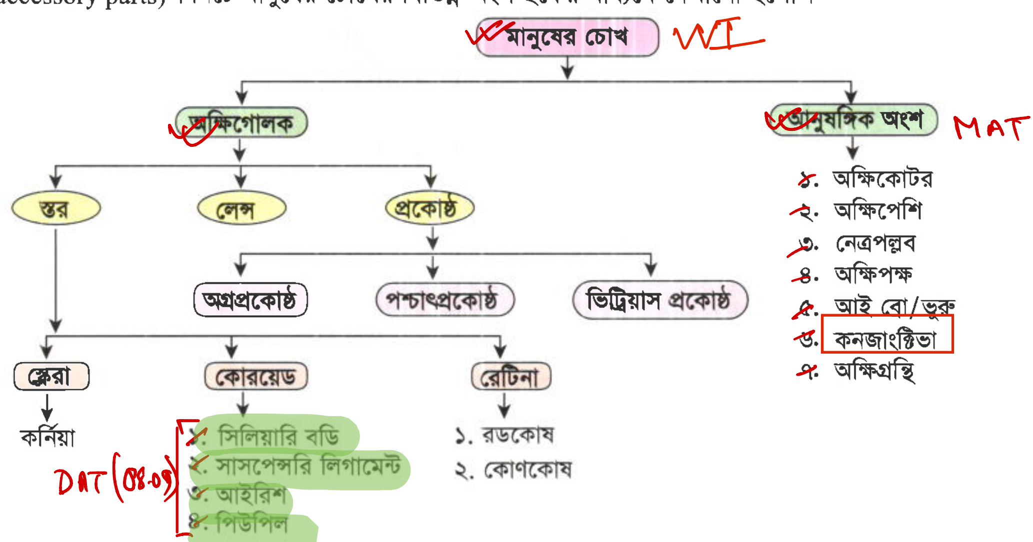

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়–

অক্ষিগোলক (Eye Ball)

মানুষের চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় এটি **অক্ষিগোলক** নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোলক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত–A. **অক্ষিগোলকের স্তর**, B. **লেন্স** ও C. **প্রকোষ্ঠ**। নিচে অংশগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

A. অক্ষিগোলকের স্তর (Layers of Eye ball)

১. স্ক্লেরা (Sclera) বা স্ক্লেরোটিক স্তর (Sclerotic layer) : এটি অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা, অস্বচ্ছ ও তন্তুময় স্তর। এটি অস্বচ্ছ হলেও চোখের সামনের দিকে খুব পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দায় পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছ পর্দাটির নাম **কর্নিয়া** (cornea)। কর্নিয়ায় রক্ত সরবরাহ নেই। এটি অ্যাকুয়াস হিউমার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। আইরিশের উপরের অংশ ছাড়া স্ক্লেরার সম্মুখের সাদা অংশ একটি পাতলা স্বচ্ছ পর্দা বা **কনজাংক্টিভা** (conjunctiva)-য় আবৃত। পর্দাটি স্ক্লেরাকে স্ক্লেরা ও কর্নিয়ার সংযোগস্থল (sclero-corneal junction) পর্যন্ত আবৃত করে এবং চোখের পাতার ভিতরেও বিস্তৃত থাকে। **কনজাংক্টিভা কর্নিয়াকে আবৃত করে না।**

কাজ : স্ক্লেরা চোখের আকৃতি বজায় রাখে, চোখকে সংরক্ষণ করে ও পেশি সংযুক্ত রাখে। কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখের ভিতর আলো প্রবেশ করে। কনজাংক্টিভা –(i) চোখের সম্মুখতল আর্দ্র ও পিচ্ছিল রাখে; (ii) অক্ষিপল্লবের ভিতরের তল সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে এবং (iii) চোখকে ধুলাবালি ও জীবাণু প্রবেশ থেকে রক্ষা করে।

২. কোরয়েড (Choroid) : এটি স্ক্লেরার নিচে অবস্থিত রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ ও মেলানিন (melanin) **রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর**। মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো দেখায়।

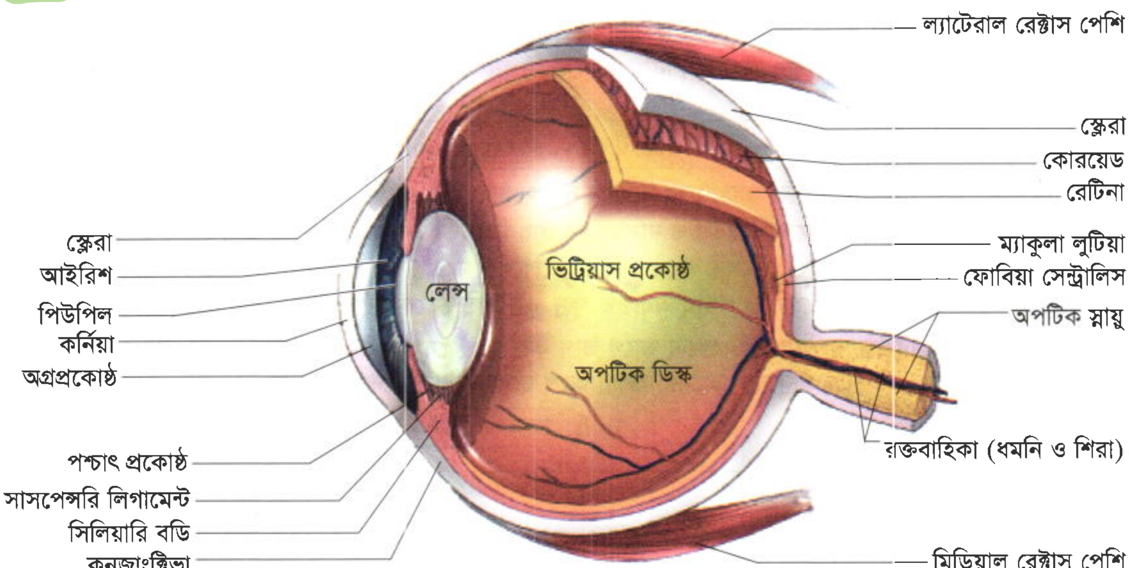

চিত্র ৮.১৩ : মানুষের চোখের অন্তর্গঠন

কোরয়েড নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত–

- **আইরিশ (Iris) :** কর্নিয়ার ঠিক পিছনে চোখের উন্মুক্ত অংশে কোরয়েড স্তরটি স্ক্লেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বৃত্তাকার থালার মতো যে অংশ গঠন করে সেটি **আইরিশ**। দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে আইরিশ গঠিত।

কাজ : লেন্সে পরিমিত আলো প্রবেশের জন্য আইরিশ পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে পিউপিলকে ছোট-বড় করে।

- **সিলিয়ারি বডি (Ciliary body) :** এটি একটি স্থূল বলয়াকার অংশ এবং আইরিশ ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। সিলিয়ারি বলয়, সিলিয় প্রবর্ধক ও সিলিয়ারি পেশি নিয়ে এটি গঠিত।

কাজ : সিলিয়ারি পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়। সিলিয়ারি বডি অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন করে।

সাসপেন্সরি লিগামেন্ট (Suspensory ligament) : লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে (ফিতাসদৃশ দৃঢ় ও নমনীয় তন্তুময় যোজক টিস্যু) **সাসপেন্সরি লিগামেন্ট** বলে। এর অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সাহায্যে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

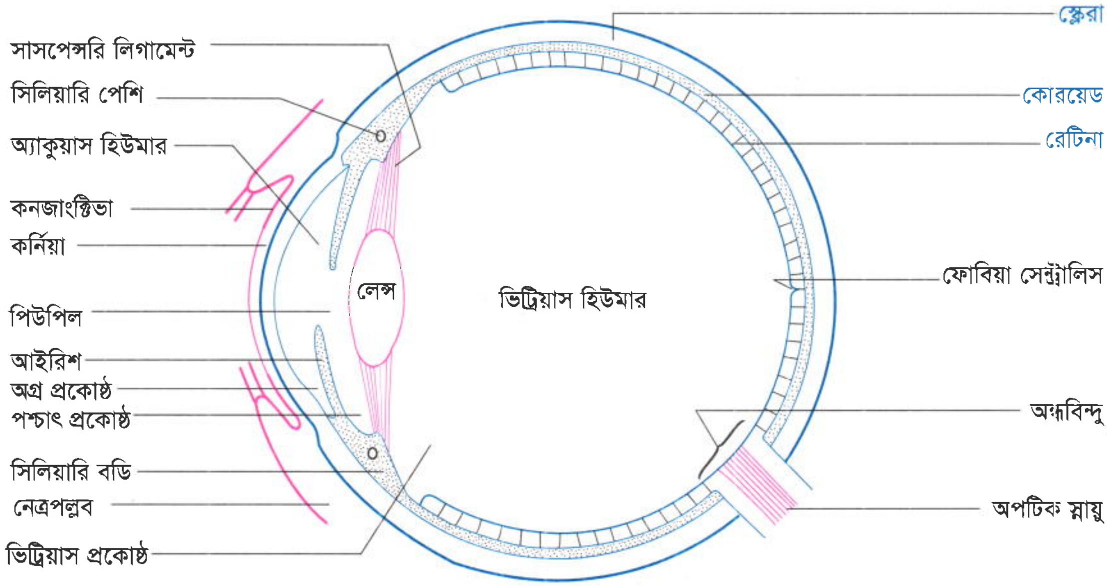

চিত্র ৮.১৪ : চোখের লম্বচ্ছেদ (চিত্রানুগ)

পিউপিল (Pupil) : পিউপিল হচ্ছে আইরিশের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং বৃত্তাকার ও অরীয় পেশিতে বেষ্টিত একটি ছোট ছিদ্রবিশেষ। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী আইরিশের অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিলটি প্রয়োজন মতো ছোট-বড় করা যায়। অরীয় পেশি সঙ্কুচিত হলে পিউপিল প্রসারিত হয়, বৃত্তাকার পেশির সঙ্কোচনে পিউপিল সঙ্কুচিত হয়।

কাজ : পিউপিলের মধ্য দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় ও উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

৩. রেটিনা (Retina) : রেটিনা হচ্ছে অক্ষিগোলকের প্রাচীরের সর্বাপেক্ষা ভিতরের স্তর এবং একমাত্র আলোক সংবেদী অংশ। এটি ১০টি উপস্তরে গঠিত। বাইরের কোরয়েড সংলগ্ন স্তরটি রঞ্জক পদার্থবিশিষ্ট আলো সংবেদী কোষস্তরে নির্মিত। চোখের সামনের দিকে রেটিনা সিলিয়ারি অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। রেটিনার একটি স্থানে **অপটিক স্নায়ু** প্রবেশ করে। রেটিনায় দুধরনের আলো-সংবেদী কোষ আছে, যথা-**রড** (rod) ও **কোণ** (cone) কোষ। রডকোষগুলোর বাইরের খণ্ড রড আকৃতির। এতে **রডোপসিন** (rhodopsin) নামক আলো সংবেদী রঞ্জক পদার্থ ও ভিটামিন A থাকে। কোণকোষগুলোর বাইরের খন্ড কোণাকার ও এতে **আয়োডপসিন** (iodopsin) নামক আলো সংবেদী রঞ্জক পদার্থ উপস্থিত। এছাড়া এটি **ফটোপসিন** (photopsin) নামক প্রোটিন সমৃদ্ধ। চোখে রডকোষের সংখ্যা ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ, অন্যদিকে কোণকোষের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ।

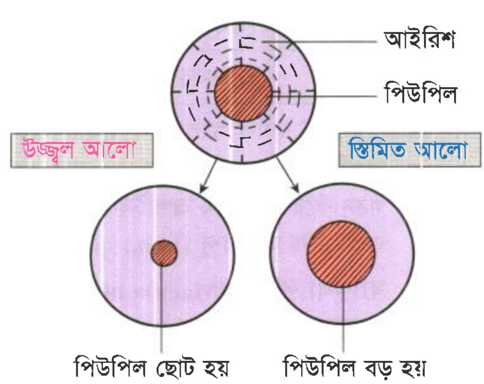

চিত্র ৮.১৫ : আইরিশের মাধ্যমে পিউপিল নিয়ন্ত্রণ

কোণকোষগুলো উজ্জ্বল আলো ও রঙিন বস্তু দর্শনের জন্য এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী। রডকোষগুলো অনুজ্জ্বল আলোতে (dim light) **দর্শনের উপযোগী।** উভয় কোষের ভিতরের খন্ডে প্রচুর পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। কোষের প্রান্তীয় সিন্যাপটিকাল অংশ স্ফীত হয়ে **বাল্ব** (bulb) গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে।

তিন ধরনের কোণকোষ আছে বলে মনে করা হয়। প্রথম ধরনের কোণকোষ লাল রং, দ্বিতীয় ধরন সবুজ রং এবং তৃতীয় ধরন নীল রঙের জন্য। তিন ধরনের কোষের সবই সমানভাবে উদ্দীপ্ত হলে সাদা রং দৃষ্ট হয়।

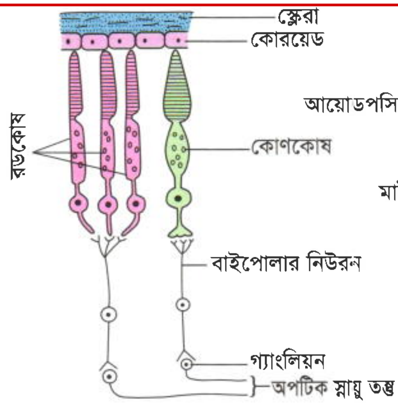

চিত্র ৮.১৬ : রেটিনার প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র ৮.১৭ : কোণকোষ (বায়ে) এবং রডকোষ (ডানে)

রডকোষ ও কোণকোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রডকোষ	কোণকোষ
১. আকার-আকৃতি	লম্বা ও সরু; ২ মাইক্রোমিটার পুরু এবং ৫০ মাইক্রোমিটার লম্বা।	খাটো ও প্রশস্ত; ৩-৫ মাইক্রোমিটার পুরু ও ৪০ মাইক্রোমিটার লম্বা।
২. গঠন	বাইরের খণ্ড রড আকৃতির এবং রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।	বাইরের খন্ড কোণ আকৃতির এবং আয়োডপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।
৩. সংখ্যা	প্রতি চোখে ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।	প্রতি চোখে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ।
৪. সংবেদনশীলতা	আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল, তাই রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।	আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল, তাই দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।
৫. প্রতিবিম্ব	বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।
৬. ধরন	কেবল এক ধরনের।	তিন ধরনের।
৭. রোগ	এ কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হলে রাতকানা রোগ হয়।	এ কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ণান্ধ রোগ হয়।

রেটিনায় নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **অপটিক ডিস্ক (Optic disc) :** অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে নিউরনের অ্যাক্সনগুলো মিলিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে তার নাম **অপটিক ডিস্ক**। এখানে কোনো রড ও কোণকোষ না থাকায় এটি আলোক সংবেদী নয়। তাই একে **অন্ধবিন্দু** (blind spot)-ও বলা হয়।
- **ম্যাকুলা লুটিয়া (Macula lutea) :** অপটিক ডিস্কের উপরে একটি ডিম্বাকার ও হলদে অঞ্চল থাকে। একে **ম্যাকুলা লুটিয়া** বলে। এর কেন্দ্রে ছোট একটি গর্ত (pit) থাকে যার নাম **ফোবিয়া সেন্ট্রালিস** (fovea centralis) বা **পীতবিন্দু**। এ অংশে কিছু সংখ্যক রডকোষ কিন্তু প্রচুর কোণকোষ দেখা যায়।
- **অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) :** রেটিনা স্তরে গ্যাংলিয়নসমৃদ্ধ নিউরনের অ্যাক্সনগুলো একত্রিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

অন্ধ বিন্দু (Blind spot) ও পীত বিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (Yellow spot or Fovea centralis) এর পার্থক্য		
তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	অন্ধ বিন্দু (Blind spot)	পীত বিন্দু (Yellow spot)
১. অবস্থান	চোখের পিছনে কর্নিয়ার বিপরীত দিকে যেখান থেকে অপটিক স্নায়ু রেটিনা ত্যাগ করে।	চোখের পিছনে কর্নিয়ার বিপরীত দিকে রেটিনায় যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় আলোক রশ্মি ফোকাস হয়।
২. রড ও কোণ কোষ	রডকোষ ও কোণকোষ উভয়েই অনুপস্থিত।	অধিক সংখ্যক কোণকোষ ও অল্প কিছু রডকোষ থাকে।
৩. কাজ	এখানে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না।	এখানে বস্তুর সর্বাধিক স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

রেটিনার কাজ : (i) রেটিনা ফটোগ্রাফিক প্লেটের মতো কাজ করে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে; (ii) এর কোণকোষগুলো তীব্র আলোয় ও রডকোষগুলো অল্প আলোয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে; (iii) পীতবিন্দুতে দর্শনীয় বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

B. লেন্স (Lens)

পিউপিলের পিছনে অবস্থিত ও সিলিয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা একটি স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল চাকতির মতো অংশকে **লেন্স** বলে। লেন্সের পিছনের চেয়ে সামনের দিক বেশি চাপা, নরম ও কিছুটা হলুদ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি আরো চাপা, হলদে ও দৃঢ় হয়, তাই এর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলিয় পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণে লেন্সও সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়।

কাজ: (i) লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি বেঁকে হয়ে রেটিনায় নিক্ষিপ্ত হয়; (ii) বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

C. অক্ষিগোলকের গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ (Chambers of Eye Ball)

অক্ষিগোলকে তরল পদার্থপূর্ণ তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ আছে।

i. অগ্রপ্রকোষ্ঠ (Anterior chamber) : এটি কর্নিয়া ও আইরিশের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ। **অ্যাকুয়াস হিউমার** (aquous humour) নামক পানির মতো তরল পদার্থ দিয়ে প্রকোষ্ঠটি ভরা থাকে।

ii. পশ্চাৎপ্রকোষ্ঠ (Posterior chamber) : এটিও অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ এবং আইরিশ ও লেন্সের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত প্রকোষ্ঠ।

iii. ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ (Vitreous chamber) : এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী বড় প্রকোষ্ঠ যা **ভিট্রিয়াস হিউমার** (vitreous humour) নামক জেলির মতো স্বচ্ছ চটচটে পদার্থে ভরতি।

অ্যাকুয়াস হিউমার আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে, চোখের সম্মুখ অংশের আকৃতি ঠিক রাখে এবং লেন্স ও কর্নিয়ায় পুষ্টি জোগায়।

ভিট্রিয়াস হিউমার প্রকৃতপক্ষে ডিমের সাদা অংশের মতো ঘন কিন্তু স্বচ্ছ। ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়াল্যুরোনিক এসিড (hyaluronic acid)-এ ভিট্রিয়াস হিউমার গঠিত। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে এবং অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।

চোখের আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory Parts of Eye)

১. অক্ষিকোটর (Orbit) : এটি মস্তক ও মুখমন্ডলের অস্থি নির্মিত প্রাচীরে আবদ্ধ একটি ফাঁপা গর্তবিশেষ। এতে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২. অক্ষিপেশি (Eye muscles) : অক্ষিকোটরে (orbit) দুইরকম পেশি থাকে– **এক্সট্রিনসিক** (extrinsic or extraocular) ও **ইন্ট্রিনসিক** (intrinsic)। যেসব পেশি অক্ষিগোলকের বাইরের দিকে অবস্থান করে সেগুলোকে এক্সট্রিনসিক পেশি বলে। অন্যদিকে যেসব পেশি অক্ষিগোলকের ভিতরে থাকে সেগুলোকে বলে ইন্ট্রিনসিক পেশি। সিলিয়ারি পেশি, আইরিশের পেশি ইত্যাদি ইন্ট্রিনসিক পেশির উদাহরণ।

প্রত্যেক অক্ষিগোলকের বাইরের দিকে ছয়টি করে **এক্সট্রিনসিক পেশি** থাকে। এর মধ্যে ৪টি **রেক্টাস** (rectus) এবং ২টি **অবলিক** (oblique)। এসব পেশিতে করোটি স্নায়ু বিস্তৃত থাকে। পেশিগুলো অক্ষিগোলককে সঠিক স্থানে ধরে রাখে। তাছাড়া গোলককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে সাহায্য করে। পেশিগুলো নিম্নরূপ :

MAT (06-07)
MAT (12-13)

- **মিডিয়াল রেক্টাস (Medial rectus)** : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের ভিতরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ল্যাটেরাল রেক্টাস (Lateral rectus)** : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের বাইরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র রেক্টাস (Superior rectus)** : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের উপর দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র রেক্টাস (Inferior rectus)** : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের নিচের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক (Superior oblique)** : অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র অবলিক (Inferior oblique)** : অক্ষিগোলককে সুপিরিয়র অবলিক পেশির বিপরীতে ঘুরতে সাহায্য করে।

[লিভেটর পালপেব্রি সুপিরিওরিস (Levator palpebrae superioris) নামক পেশি ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লবকে উপরে তুলতে সাহায্য করে।]

৩. অক্ষিপল্লব বা চোখের পাতা (Eyelid) : প্রত্যেক চোখের উপরে ও নিচে লোমযুক্ত পেশিবহুল পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। উপরেরটি **ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব** ও নিচেরটি **নিম্ন অক্ষিপল্লব**। এছাড়া আরো একটি অক্ষিপত্র রয়েছে যা **উপ-অক্ষিপল্লব** বা **নিকটিটেটিং পর্দা** (nictitating membrane) নামে পরিচিত। এটি মানুষের একটি **লুপ্তপ্রায় নিষ্ক্রিয়** অঙ্গ (vestigeal organ) হিসেবে উভয় চোখের ভিতরের কোণায় অবস্থিত এবং দেখতে লালচে রঙের মাংসপিণ্ডের মতো। অক্ষিপল্লব ধূলাবালি, তীব্র আলো ও বাতাস থেকে চোখকে রক্ষা করে।

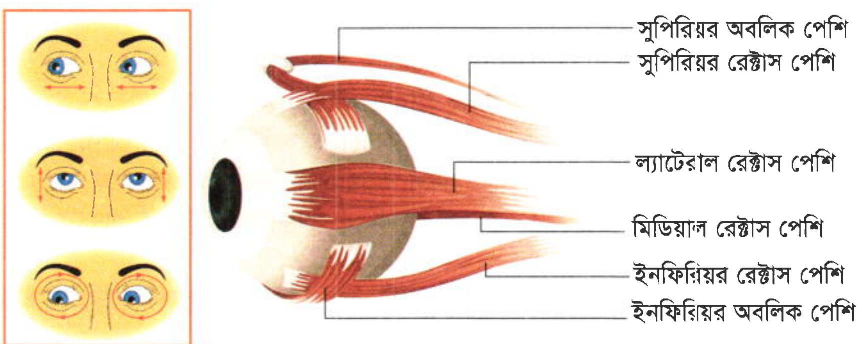

চিত্র ৮.১৮ : চোখের পেশিসমূহ

৪. অক্ষিপক্ষ (Eyelash) : চোখের পাতার লোমকে **অক্ষিপক্ষ** বলে। এগুলো চোখে ধূলাবালি প্রবেশে বাধা দেয়।

৫. ভুরু (Eye brow) : চোখের পাতার উপর অংশের লোমকে **ভুরু** বা **আই ব্রো** বলে। কপাল থেকে গড়িয়ে আসা ঘামের চোখে প্রবেশ প্রতিহত করাই এর কাজ।

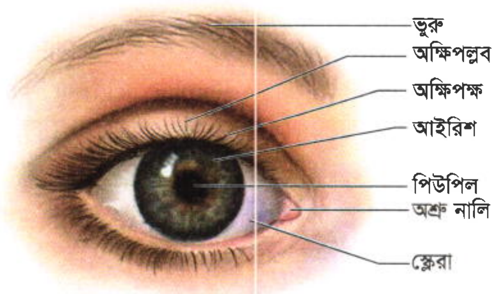

চিত্র ৮.১৯ : মানুষের চোখের আনুষঙ্গিক অংশসমূহ

৬. অক্ষিগ্রন্থি (Eye glands) : চোখে রস ক্ষরণকারী কোষগুলোকে **অক্ষিগ্রন্থি** বলে। চক্ষুতে তিন ধরনের অক্ষিগ্রন্থি থাকে, যথা–

ক. ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি (Lacrimal gland) : এটি অক্ষিগোলকের অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। এটি **অশ্রু** (tear) নামে এক ধরনের মৃদু লবণাক্ত জলীয় তরল ক্ষরণ করে যাতে ব্যাকটেরিয়ানাশক **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম থাকে।

কাজ : (i) এটি থেকে নিঃসৃত অশ্রু দিয়ে ধূলোবালি বিধৌত করে চোখ পরিষ্কার রাখে, কনজাংক্টিভাকে নরম ও সিক্ত রাখে; এবং কর্নিয়াকে পুষ্ট করে; (ii) অশ্রুতে বিদ্যমান লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে চক্ষুকে সুরক্ষা দেয়।

MAT(০৮-০৯)

খ. হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি (Harderian gland) : এটি অক্ষিগোলকের পশ্চাৎভাগের অক্ষীয়দেশে অবস্থিত। এটি এক ধরনের পাতলা তৈলাক্ত রস ক্ষরণ করে।

কাজ : এর তৈলাক্ত ক্ষরণ চোখের পাতা, কনজাংক্টিভা ও কর্নিয়াকে সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে।

গ. মিবোমিয়ান গ্রন্থি (Meibomian gland) : এটি চোখের পাতার কিনারায় অবস্থিত এবং এক ধরনের গাঢ় তৈলাক্ত রস ক্ষরণ করে।

কাজ : এর তৈলাক্ত ক্ষরণ কনজাংক্টিভা ও কর্ণিয়াকে পিচ্ছিল রাখে।

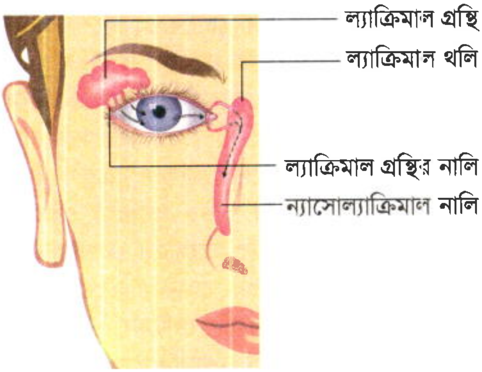

চিত্র ৮.২০ : ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি

৭. কনজাংক্টিভা (Conjunctiva) : অক্ষিপল্লবের ভিতরের অংশ এবং স্ক্লেরার অগ্রাংশ (সাদা অংশ) যে স্বচ্ছ পাতলা মিউকাস স্তরে আবৃত থাকে তার নাম কনজাংক্টিভা।

কাজ : (i) এটি চোখকে ধূলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে; (ii) চোখের সম্মুখতল এবং অক্ষিপল্লবের ভিতরের তল আর্দ্র ও পিচ্ছিল রাখে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া (Formation of Image and Mechanism of Vision)

দর্শন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং পাঁচটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা– (i) চোখে আলোর প্রবেশ; (ii) রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠন; (iii) প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর; (iv) প্রতিবিম্ব সম্পর্কে স্নায়ু অনুভূতি (impulse) মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং (v) মস্তিষ্কের মাধ্যমে স্নায়ু অনুভূতির বিশ্লেষণ ও দর্শন।

আমরা যে বস্তুকে দেখি, আলোকিত সে বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে কর্নিয়ার উপর পড়ে। স্বচ্ছ কর্নিয়ায় প্রতিসরিত আলোক রশ্মি পিউপিলের মাধ্যমে লেন্সে এসে পড়ে। দ্বিউত্তল লেন্স এ আলোক রশ্মিকে পুনরায় প্রয়োজনমত প্রতিসরণের মাধ্যমে রেটিনায় প্রতিফলিত করে। ফলে রেটিনার উপর বস্তুর একটি উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনায় সৃষ্ট

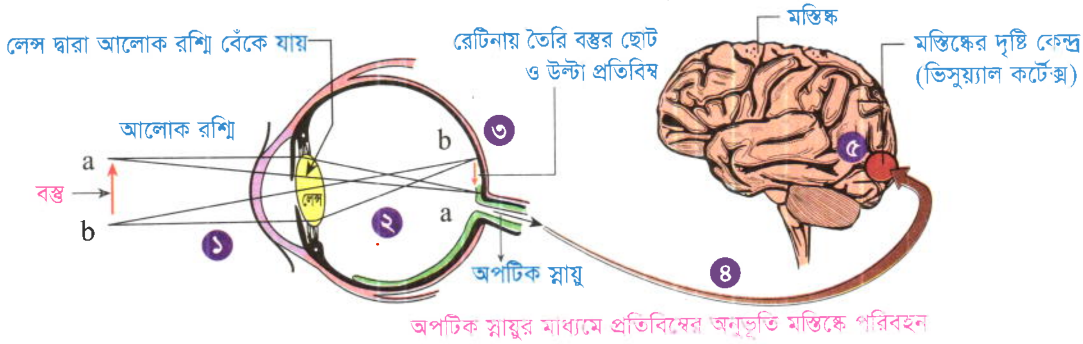

চিত্র ৮.২১ : দর্শন কৌশল

প্রতিবিম্ব রেটিনার আলোক সংবেদী কোষ (রডকোষ ও কোণকোষ)-কে উদ্দীপ্ত (stimulate) করে। আলোক সংবেদী কোষের এ অনুভূতি বাইপোলার কোষ, গ্যাংলিয়ন কোষ এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অপটিক লোবের দৃষ্টি কেন্দ্র বা **ভিসুয়্যাল কর্টেক্স** (visual cortex)-এ পৌঁছায়। এ অঞ্চলে স্নায়ু অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত উল্টা প্রতিবিম্বের তথ্য বিশ্লেষণ হয় ফলে মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়।

দর্শন কৌশলের গতিপথ হচ্ছে ঃ

আলোকরশ্মি → কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার → পিউপিল → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → রেটিনা → অপটিক স্নায়ু → মস্তিষ্কের ভিসুয়্যাল কর্টেক্স।

উপযোজন (Accommodation)

দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন না করেই সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সঙ্কোচন বা প্রসারণে ও লেন্সের বক্রতার তথা ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পষ্ট দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে প্রক্রিয়াকে উপযোজন বলে। চোখ থেকে ৬ মিটার দূরত্বে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। এ দূরত্বের কম বেশি হলে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় ফোকাসের জন্য উপযোজন প্রয়োজন। মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে উপযোজন একটি বৈশিষ্ট্য। এ সময় সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির সঙ্কোচনের ফলে সাসপেনসরি লিগামেন্টের প্রসারণ ঘটে। ফলে লেন্সের বক্রতা বাড়ে ও খাটো হয়। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে যায়, কাছের বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। দূরের বস্তু দেখার সময় এর উল্টোটি ঘটে। অর্থাৎ সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির প্রসারণ, সাসপেনসরি লিগামেন্টের সঙ্কোচনে লেন্সের বক্রতা কমে, লেন্স সরু ও লম্বা হয় এবং ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায় এবং দূরের বস্তু থেকে আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠন করে। তখন বস্তুটি দৃশ্যমান হয়। যে দৃষ্টিতে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না তাকে **হাইপার- মেট্রোপিয়া** (hypermetropia) বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহারে সমস্যার সমাধান হয়। যদি দূরের বস্তু দেখতে সমস্যা হয় তবে তাকে **মায়োপিয়া** (myopia) বলে। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এ সমস্যা দূরীভূত হয়।

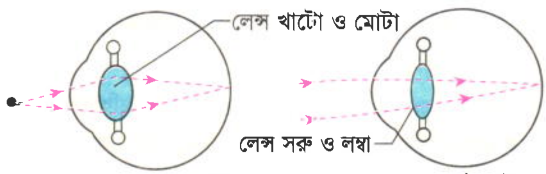

চিত্র ৮.২২ : মানুষের চোখের উপযোজন

দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Sterioscopic vision)

মানুষের দৃষ্টিকে **দ্বিনেত্র দৃষ্টি** বলে। কারণ আমরা কোনো দৃশ্যযোগ্য বস্তু একই সাথে দুচোখের সাহায্যে এককভাবে দেখতে পাই। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (visual cortex) একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একীভূত হয়, ফলে আমরা দুচোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখি।

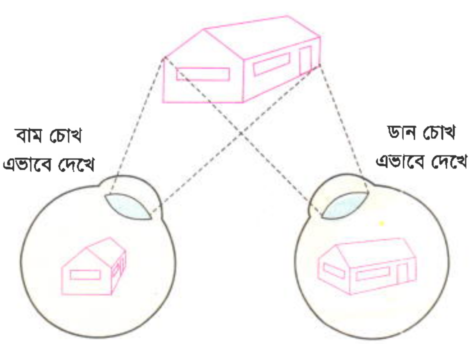

চিত্র ৮.২৩ : মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি

মানুষের চোখদুটি মাথার সামনে ৬.৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রত্যেক চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিবিম্ব দুটির একটি থেকে অন্যটি কিছুটা আলাদা। উভয় উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপনাকে সমন্বয় সাধন করে। ফলে বস্তুর একটি **ত্রিমাত্রিক** (three dimensional) চিত্র দেখা যায়।

দ্বিনেত্র দৃষ্টির শর্ত : (i) নির্দিষ্ট বস্তুতে নিবদ্ধ করার জন্য অক্ষিপেশিকে সঠিকভাবে সঙ্কুচিত হতে হবে; (ii) দুচোখের রেটিনায় সদৃশ বিন্দুর উপস্থিতি থাকতে হবে; (iii) দুচোখের রেটিনায় প্রায় একইরকম প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে হবে; (iv) দুটি বীক্ষণক্ষেত্রকে এক জায়গায় পরস্পর মিলে যেতে হবে।

মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি থাকার সুবিধা : (i) দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে একইভাবে দেখে। (ii) কোনো বস্তুকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে। (iii) দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় হয়। (iv) বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। (v) বিভিন্ন কাজ সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

চক্ষুর দৃষ্টিতে ভিটামিন-A এর ভূমিকা : ভিটামিন-A এর প্রধান উপাদান **রেটিনল** রড ও কোণ কোষগুলোর আলোক সংবেদী রোডপসিন ও আয়োডপসিন রঞ্জকের গঠনে অংশ নেয়। ভিটামিন-A এর অভাবে এসব রঞ্জকের ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় এবং **রাতকানা** (Night blindness or Nyctalopia) রোগ হয়।

চোখের ছানি : বার্ধক্য ও অপুষ্টিজনিত কারণে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টি শক্তি কমে যায়। এ অবস্থা **চোখের ছানিপড়া** (eye cataract) নামে পরিচিত। অপারেশনের মাধ্যমে অস্বচ্ছ লেন্সটি সরিয়ে তার স্থলে কৃত্রিম লেন্স স্থাপন করে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

চোখের প্রধান অংশগুলোর অবস্থান ও কাজ

Reading

চোখের অংশ	অবস্থান	প্রধান কাজ
১. কর্নিয়া	অক্ষিগোলকের সামনের দিকের অংশ; স্বচ্ছ; এবং কোটরের বাইরে অবস্থিত।	(ক) প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। (খ) আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে।
২. স্ক্লেরা	অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা অংশ; অক্ষিকোটরে অবস্থিত।	(ক) অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে। (খ) চোখকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
৩. কোরয়েড	অক্ষিগোলকের মধ্যবর্তী স্তর, এবং রঞ্জক পদার্থযুক্ত।	(ক) অক্ষিগোলকে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিফলন রোধ করে। (খ) অক্ষিগোলকের পুষ্টি প্রদান করে।
৪. আইরিশ	কর্নিয়া এবং লেন্সের মাঝে অ্যাকুয়াস হিউমারে ঝুলন্ত একটি পাতলা গোলাকার সঙ্কোচনশীল, মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত চাকতি বিশেষ।	পিউপিলের ছিদ্র ছোট-বড় করে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. সিলিয়ারি বডি	স্থূল পেশিস্তর লেন্সকে পরিবেষ্টন করে আবর্তকারে অবস্থান করে।	লেন্সের উপযোজনে সহায়তা করে।
৬. রেটিনা	অক্ষিগোলকের একেবারে ভিতরের স্নায়ুসমৃদ্ধ আবরণ।	বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৭. লেন্স	আইরিশের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত দ্বি-উত্তল বৃত্তাকার চাকতি।	(ক) আলোর প্রতিসরণ ঘটায়। (খ) আলোকরশ্মিকে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে।
৮. পিউপিল	আইরিশের মাঝখানে অবস্থিত পাতলা শ্লেষ্মাস্তর বিশেষ।	এর মাধ্যমে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।
৯. কনজাংক্টিভা	অক্ষিপল্লবের ভিতরের অংশ এবং স্ক্লেরার ভগ্নাংশে অবস্থিত পাতলা মিউকাস স্তর।	চোখকে ধূলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে।
১০. অন্ধবিন্দু	রেটিনা ও অপটিক স্নায়ুর মিলনস্থলে অবস্থিত।	এখানে অপটিক স্নায়ু সংযুক্ত হয়।
১১. ফোবিয়া সেন্ট্রালিস	পিউপিলের বিপরীত দিকে রেটিনার উপর অবস্থিত।	বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এখানেই সবচেয়ে ভাল হয়।
১২. রডকোষ	রেটিনায় অবস্থিত।	মৃদু আলো (dim light) শোষণ করে।
১৩. কোণকোষ	রেটিনায় অবস্থিত।	উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণ করে।
১৪. অ্যাকুয়াস হিউমার	কর্নিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত।	(ক) লেন্সের পুষ্টি যোগায়। (খ) বিবর্ধক মাধ্যমরূপে কাজ করে।
১৫. ভিট্রিয়াস হিউমার	লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্থানে।	(ক) রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে। (খ) অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।
১৬. অশ্রুগ্রন্থি	চোখের বহিঃকোণের ঠিক উপরে ছোট পটল আকৃতি কিংবা অনেকটা খোলসযুক্ত বাদামের মতো গ্রন্থি।	(ক) অশ্রুক্ষরণ করে চোখকে আর্দ্র রাখে। (খ) চোখের মধ্যে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে।

কান– শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ (Ear– Hearing and Equilibrium Organ)

কান এমন এক বিশেষ ইন্দ্রিয় যা একাধারে **শ্রবণ** ও **দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ**-এ অংশগ্রহণ করে। মানুষের মাথার দুপাশে ও চোখের পিছনে করোটির শ্রুতিকোটরে দুটি কান অবস্থান করে।

মানুষের প্রতিটি কান ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা–**বহিঃকর্ণ** (External ear), **মধ্যকর্ণ** (Middle ear) ও **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear)। কানের অংশগুলো নিচে ছক আকারে দেখানো হলো।

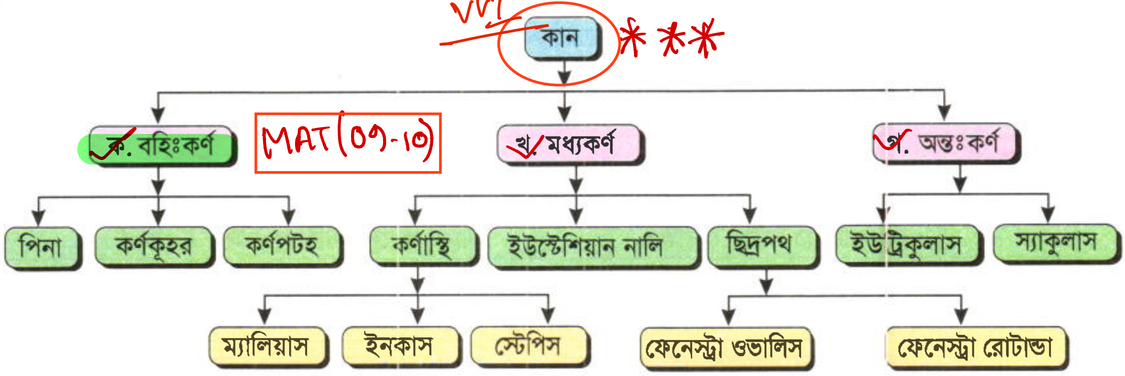

নিচে কানের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. বহিঃকর্ণ (External Ear)

বাইরের দিক থেকে এটি কানের প্রথম ভাগ এবং নিম্নোক্ত ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. পিনা (Pinna) বা অরিকল (Auricle) বা কর্ণছত্র : এটি মাথার দুপাশে অবস্থিত ও স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি (elastic cartilage) নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত ও লোমশ অংশ। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পিনার গড় দৈর্ঘ্য ৫.৯–৬.৪ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ২.৯–৩ সেন্টিমিটার। এর অভ্যন্তরে পেশিতন্তু থাকলেও মানুষ কান নাড়াতে পারে না। কোনো শব্দ ভালভাবে শোনার জন্য যে দিক থেকে শব্দ আসে সেদিকে মাথাসহ কানের ছিদ্রকে ঘোরাতে হয়।

কাজ : শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে অডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহরে প্রেরণ করা পিনার কাজ।

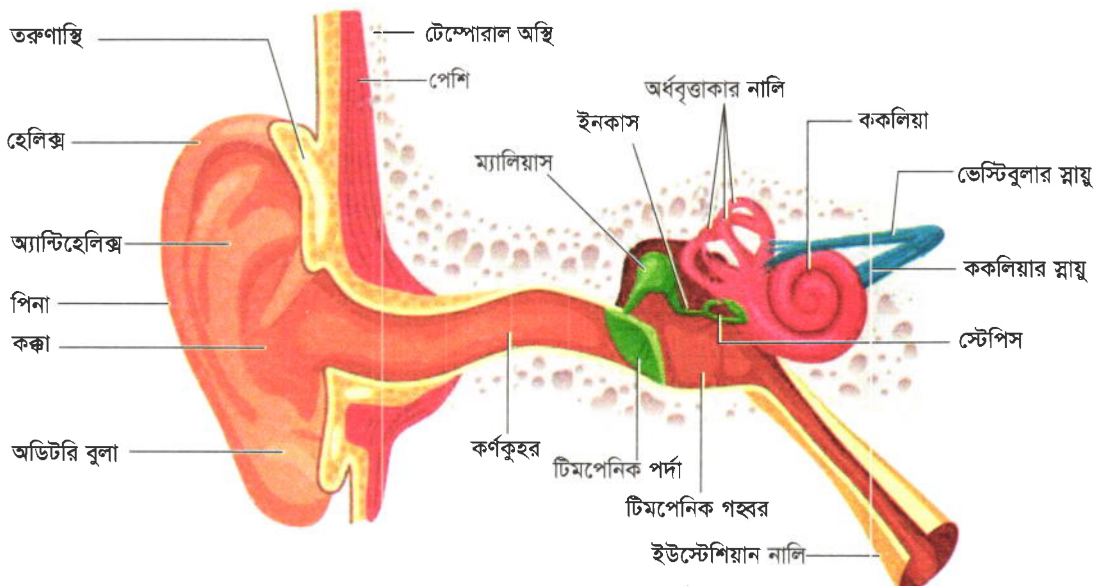

চিত্র ৮.২৪ : মানুষের কানের অন্তর্গঠন

২. অডিটরি মিটাস (Auditory meatus) বা কর্ণকুহর : পিনার কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালিপথ কানের **টিমপেনিক পর্দা** (কর্ণপটহ) পর্যন্ত বিস্তৃত তার নাম **কর্ণকুহর** বা **অডিটরি মিটাস**। এর বাইরের এক-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং ভিতরের দুই-তৃতীয়াংশ অস্থিতে (temporal bone) গঠিত। এটি সূক্ষ্ম **রোমযুক্ত** ত্বকে আবৃত। ত্বকে **সেরুমিনাস গ্রন্থি** (ceruminous glands) নামক এক প্রকার বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে। এরা মূলত এক প্রকার রূপান্তরিত ঘামগ্রন্থি এবং **সেরুমেন** (cerumen) নামক বাদামি বর্ণের মোমজাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে।

কাজ : (i) এর মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌঁছে। (ii) এতে বিদ্যমান রোম কানে ধুলোবালি প্রবেশে বাঁধা দেয়। (iii) সেরুমেন কর্ণকুহরের গাত্রে একটি তৈলাক্ত ও পিচ্ছিল আবরণ তৈরি করে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করে এবং কর্ণকুহরে প্রবেশিত জীবাণু, পোকা ইত্যাদি ধ্বংস করে। (iv) কর্ণপটহের কাজের জন্য অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

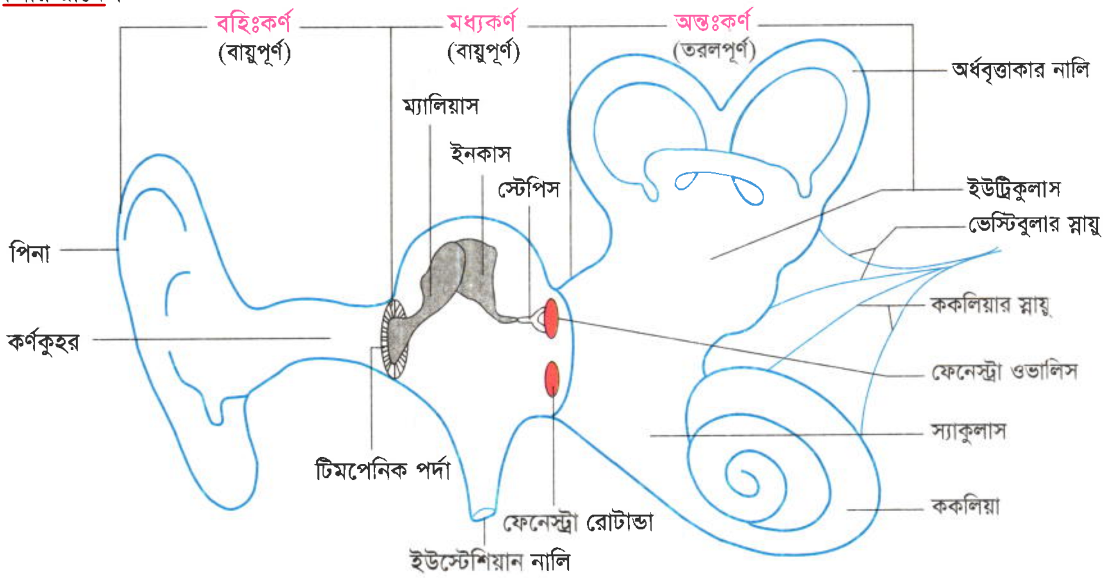

চিত্র ৮.২৫ : মানুষের কানের গঠন (চিত্রানুগ)

৩. টিমপেনিক পর্দা (Tympanic membrane) বা কর্ণপটহ : অডিটরি মিটাসের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ডিম্বাকার, স্থিতিস্থাপক পর্দাকে **টিমপেনিক পর্দা** বলে। এটি প্রায় ০.১ মিলিমিটার পুরু ও ৯ মিলি মিটার ব্যাস বিশিষ্ট। এর বাইরের দিক অবতল, ভিতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের **ম্যালিয়াস** অস্থি যুক্ত থাকে।

কাজ : (i) বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক করে রাখা। (ii) শব্দতরঙ্গে কেঁপে উঠা এবং (iii) শব্দতরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবহন করা টিমপেনিক পর্দার কাজ।

খ. মধ্যকর্ণ (Middle Ear)

মধ্যকর্ণ একটি অসম আকৃতির বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ এবং করোটির **টিমপেনিক বুলা** (tympanic bulla)-র ভিতর অবস্থিত। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

১. ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian canal) : মধ্যকর্ণের তলদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এটি একটি সরু নালি বিশেষ। টিমপেনিক পর্দার উভয় পাশের বায়ুর চাপ সমান রাখা এর কাজ। ফলে কর্ণপটহ ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

২. কর্ণাস্থি (Ear ossicles) : এগুলো মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত পরস্পর পেশি দিয়ে যুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো ৩টি ছোট অস্থি। অস্থি তিনটি হচ্ছে:

i. ম্যালিয়াস (Malleus) : হাতুড়ির মতো (hammer shaped) দেখতে এ অস্থি একদিকে টিমপেনিক পর্দার সাথে অন্যদিকে পরবর্তী অস্থি ইনকাস-এর সাথে যুক্ত।

ii. **ইনকাস (Incus) :** এ অস্থি দেখতে নেহাই (anvil)-এর মতো এবং ম্যালিয়াস ও স্টেপিসকে যুক্ত করে।

iii. **স্টেপিস (Stapes) :** এ অস্থিটি দেখতে ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো (stirrup shaped) এবং একদিকে ইনকাসের সাথে অন্যদিকে, ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে। **এটি মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অস্থি।**

কাজঃ অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিমপেনিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের অভ্যন্তরে পেরিলিম্ফে বহন করে।

৩. **ছিদ্রপথ :** মধ্যকর্ণের প্রাচীর পেরিওটিক অস্থিতে গঠিত, তবে সেখানে দুটি ছোট ছিদ্রপথ থাকে। উপর দিকে ডিম্বাকার ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা ওভালিস** (fenestra ovalis) এবং নিচের দিকের গোল ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা** (fenestra rotunda) বলে। প্রত্যেক ছিদ্রের মুখে একটি ক্ষুদ্র পাতলা পর্দা থাকে।

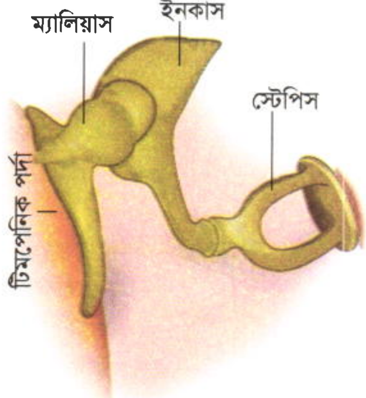

চিত্র ৮.২৬ : কর্ণাস্থি

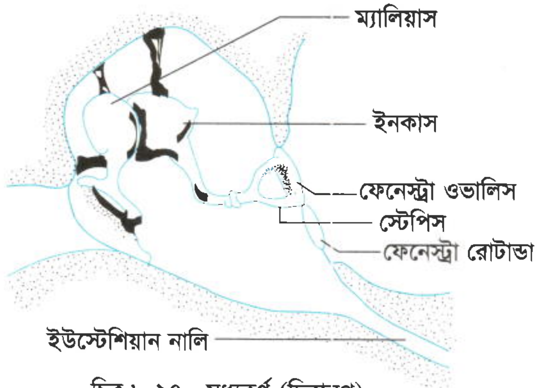

চিত্র ৮.২৭ : মধ্যকর্ণ (চিত্রানুগ)

কাজ : (i) ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে; (ii) ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা ককলিয়ায় সৃষ্ট অতিরিক্ত শব্দ তরঙ্গকে মধ্যকর্ণে প্রবাহিত করে প্রশমিত করে।

গ. অন্তঃকর্ণ (Inner Ear)

প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ করোটির **শ্রুতিকোটর** বা **অডিটরি ক্যাপসুল** (auditory capsule)-এর পেরিওটিক অস্থির (periotic bone) অভ্যন্তরে অবস্থান করে। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ **মেমব্রেনাস (ঝিল্লিময়) ল্যাবিরিন্থ** (membranous labyrinth) নামক একটি জটিল গঠন। এর ভিতরে **এন্ডোলিম্ফ** (endolymph) নামক তরল পদার্থ থাকে। **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labymph) দ্বারা মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বেষ্টিত থাকে। দুই ল্যাবিরিন্থের মধ্যবর্তীস্থান **পেরিলিম্ফ** (perilymph) তরলে পূর্ণ থাকে। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ ভারসাম্য ও শ্রবণের অঙ্গ নিয়ে গঠিত। MAT (17-18)

চিত্র ৮.২৮ : অন্তঃকর্ণের গঠন

চিত্র ৮.২৯ : অন্তঃকর্ণ (চিত্রানুগ)

ভারসাম্যের অঙ্গ (Organ of Balance) : মানুষের ভারসাম্যের অঙ্গকে **ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস** (vestibular apparatus) বলে। ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস দুটি ছোট ছোট থলি, যথা-**ইউট্রিকুলাস/ইউট্রিকল** (utriculus/utricle) ও **স্যাকুলাস/ স্যাকুল** (sacculus/ saccule) এবং মেমব্রেনাস ল্যাবিরিস্থের তরলপূর্ণ তিনটি **অর্ধবৃত্তাকার নালি** (semicircular canal) নিয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস **এন্ডোলিম্ফ** (endolymph) রসপূর্ণ গহ্বর। গহ্বরের ভিতর **ম্যাকুলা** (macula) নামক অঙ্গ থাকে। ম্যাকুলা ইউট্রিকুলাসের মেঝেতে অনুভূমিকভাবে এবং স্যাকুলাস প্রাচীরের গাত্রে উলম্বভাবে অবস্থান করে। ম্যাকুলায় **সংবেদী রোমকোষ** থাকে এবং রোমকোষের রোমগুলো $CaCO_3$ কণিকা (অটোলিথ, otolith) সমৃদ্ধ **অটোলিথিক মেমব্রেন**-এ দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে। ম্যাকুলা ও অটোলিথিক মেমব্রেনকে একত্রে **অটোকনিয়াম** (otoconium) বলে। যে কোনো দিকে মাথা বেঁকে গেলে কিছু সংখ্যক রোমকোষ উদ্দীপিত হয়ে দেহ অবস্থানের অনুভূতির উদ্রেক করে। অর্ধবৃত্তাকার নালিগুলো ইউট্রিকুলাস থেকে বিকশিত হয়। এগুলোর একটি **অনুভূমিক** এবং অন্য দুটি উলম্বভাবে অবস্থান করে। নালিগুলোও এন্ডোলিম্ফ পূর্ণ এবং নালির একটি প্রান্ত স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla)-য় পরিণত হয়েছে। অ্যাম্পুলায় **ক্যুপুলা** (cupula) নামক অঙ্গ এবং সংবেদী কোষ থাকে।

RMDAC

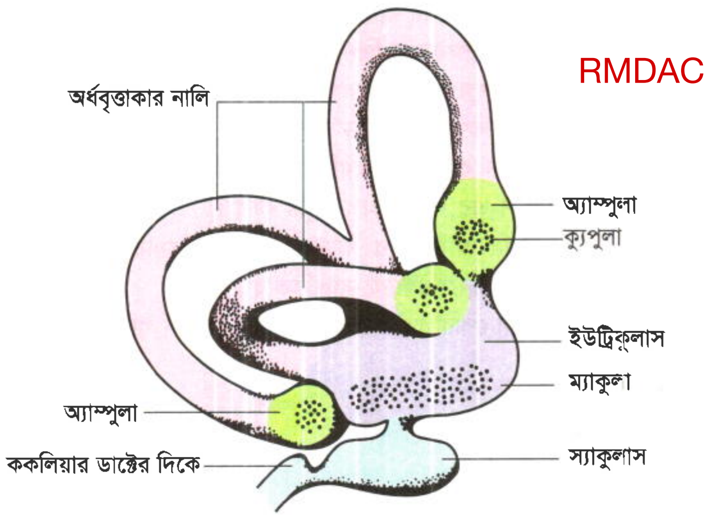

চিত্র : ৮.৩০ ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস

কাজ : ইউট্রিকুলাস, স্যাকুলাস ও অর্ধবৃত্তাকার নালিগুলো সমন্বিতভাবে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

শ্রবণ অঙ্গ (Organ of Hearing) : মানুষের শ্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে **ককলিয়া** (cochlea) বলে। স্যাকুলাসের অংকীয়দেশ থেকে বের হওয়া এ অঙ্গটি শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো। ককলিয়া প্রায় ৩৫ মি.মি. লম্বা ও দুটি পর্দা দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত : উপরে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা ভেস্টিবুলি** (scala vestibula), মাঝে এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা মিডিয়া** (scala media) এবং নিচে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা টিমপেনি** (scala tympani)। স্ক্যালা মিডিয়া উপরে **রেসনার্স ঝিল্লি** (reissner's membrane) ও নিচে **বেসিলার ঝিল্লি** (basilar membrane)-তে আবদ্ধ। বেসিলার ঝিল্লির উপরের কিছু এপিথেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে **মূল শ্রবণ অঙ্গ** অর্থাৎ **অর্গ্যান অব কর্টি** (organ of corti) গঠন করেছে। ইতালিয়ান শৈল্যবিদ **গ্যাসপেরি কর্টি** (Gaspare Corti, 1822-1876) এর নামানুসারে এ অঙ্গের নামকরণ করা হয়েছে। অর্গ্যান অব কর্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সংবেদী রোমকোষ নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম **হেলিকোট্রিমা** (helicotrema)।

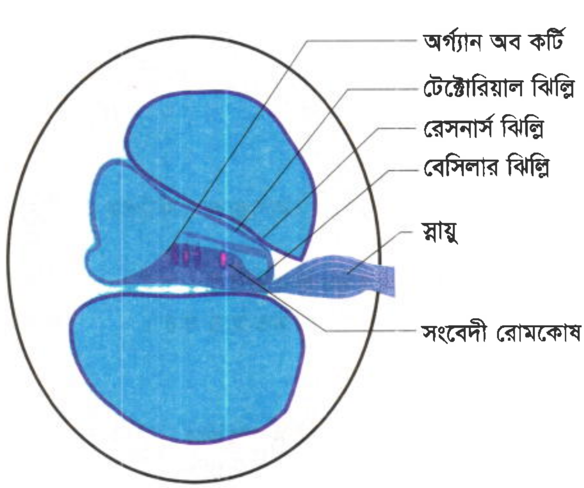

চিত্র ৮.৩১ : ককলিয়ার প্রস্থচ্ছেদ

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

মানুষের কান একই সাথে দুটি ভিন্নধর্মী কাজ সম্পাদন করে থাকে। এদের একটি **শ্রবণ** ও অন্যটি **ভারসাম্য রক্ষা**। এ দুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই।

শ্রবণ কৌশল (Mechanism of Hearing)

নিচের কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে মানুষের শ্রবণ কৌশল বর্ণনা করা হলো–

১. পরিবেশের শব্দতরঙ্গ পিনার সাহায্যে গৃহীত হয়।

২. সংগৃহীত শব্দতরঙ্গ কর্ণকুহরের মাধ্যমে ধাবিত হয়ে টিমপেনিক পর্দা বা কর্ণপটহে আঘাত হানে।

৩. এর ফলে কর্ণপটহ স্পন্দিত হয়।

৪. এ স্পন্দন বা কম্পন ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নির্মিত অস্থিমালার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ফেনেস্ট্রা ওভালিস-এর পর্দায় কাঁপন সৃষ্টি করে।

৫. মধ্যকর্ণের অস্থিমালার লিভার (lever) ক্রিয়ায় পরিবাহিত শব্দ তরঙ্গের শক্তি প্রায় বিশগুণ বেড়ে স্ক্যালা ভেস্টিবুলির পেরিলিম্ফে সঞ্চারিত হয়।

৬. এর ফলে পেরিলিম্ফ তরঙ্গায়িত হয়ে রেসনার্স পর্দাকে আন্দোলিত করে।

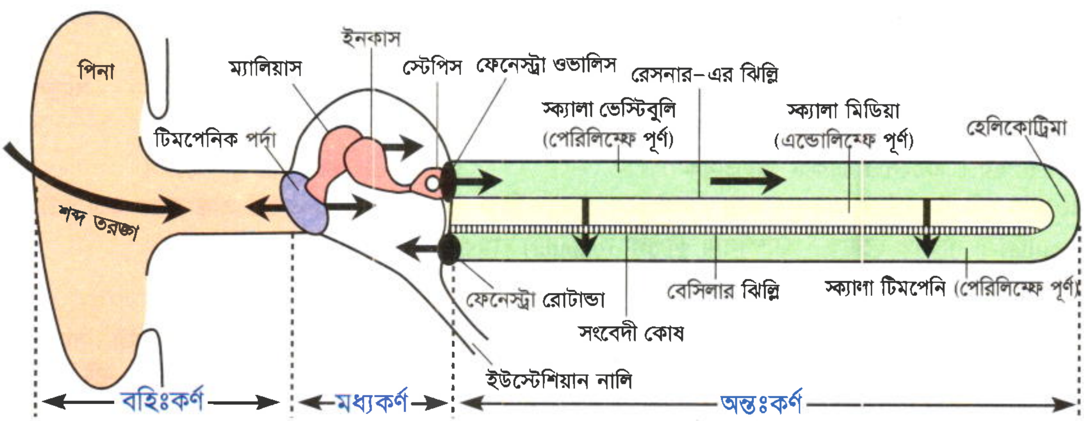

চিত্র ৮.৩২ : কানের ভিতর শব্দতরঙ্গের গতিপথের চিত্ররূপ (ককলিয়া সোজা করে দেখানো হয়েছে)

৭. এ আন্দোলন স্ক্যালা মিডিয়ার এন্ডোলিম্ফকে তরঙ্গায়িত করে।

৮. এন্ডোলিম্ফের তরঙ্গ বেসিলার পর্দায় কাঁপন সৃষ্টি করে।

৯. এ কাঁপন আবার স্ক্যালা টিমপেনির পেরিলিম্ফকে তরঙ্গায়িত করে।

১০. পেরিলিম্ফে কাঁপন সৃষ্টি হলে ককলিয়ার অর্গ্যান অব কর্টির সংবেদী রোমশ কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

১১. এ উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়।

১২. অতিরিক্ত শব্দতরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে ফিরে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়।

শ্রবণ প্রক্রিয়ার গতিপথ–

শব্দ তরঙ্গ ⇒ পিনায় বাধা ⇒ কর্ণকুহরে প্রবেশ ⇒ টিম্পেনিক পর্দায় কাঁপন

পেরিলিম্ফ ⇐ ককলিয়া ⇐ ফেনেস্ট্রা ওভালিস ⇐ (স্টেপিস ⇐ ইনকাস ⇐ ম্যালিয়াস) মধ্যকর্ণ

এন্ডোলিম্ফ ⇒ পেরিলিম্ফ ⇒ অর্গ্যান অব কর্টি ⇒ সংবেদী কোষে উত্তেজনা ⇒ স্নায়ু স্পন্দন মস্তিষ্কে প্রেরণ ⇒ **শ্রবণ**

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল (Mechanism of Maintaining Balance)

অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালির মূলে অবস্থিত **অ্যাম্পুলা** এন্ডোলিম্ফে পরিপূর্ণ ও সংবেদী রোমকোষ সম্পন্ন। এ রোমগুলোর সাথে **ক্যুপুলা** (cupula) নামক জেলীর মতো পদার্থ যুক্ত থাকে। মানুষ মাথা ঘোরালে বা কোনো দিকে দেহ বাঁকালে, সেদিকে অ্যাম্পুলার এন্ডোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে ক্যুপুলার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। এ অনুভূতি সংবেদী কোষগুলো গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাঠায়। এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে **স্যাকুলা** নামক এক অঙ্গ থাকে যা $CaCO_3$-সমৃদ্ধ **অটোলিথিক মেমব্রেন** (otolithic membrane)-এ আবদ্ধ সংবেদী রোমকোষ বহন করে। মানুষের মাথা কোনো এক দিকে হেলে গেলে অটোলিথিক মেমব্রেন রোমকোষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে রোমকোষ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুর মাধ্যমে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায় ও মাথাকে সঠিক অবস্থানে রাখতে সাহায্য করে। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (gravity) অনুভূতি শনাক্ত করে। অন্যদিকে, অ্যাম্পুলা ঘূর্ণনের অনুভূতি সংগ্রাহক (rotatory receptor) হিসেবে কাজ করে। এ দুই অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে অনবরত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। অতঃপর মস্তিষ্ক তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে মানুষ নিজেকে সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

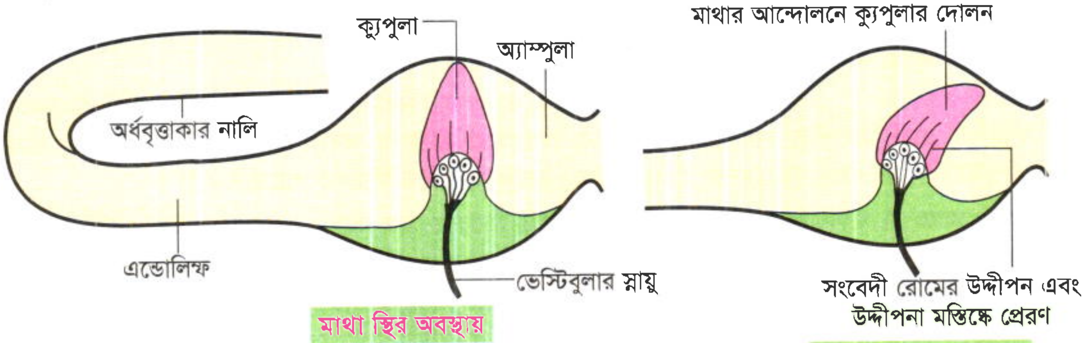

চিত্র ৮.৩৩ : মানুষের ভারসাম্য রক্ষা

কানের প্রধান অংশগুলোর অবস্থান ও কাজ

কানের অংশ	অবস্থান	কাজ
১. পিনা বা কর্ণছত্র	মাথার দুপাশে তরুণাস্থি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত অংশবিশেষ।	শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কর্ণকুহরে প্রবেশে সাহায্য করে।
২. অডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহর	কর্ণছত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নালিবিশেষ।	কর্ণপটহ পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করে।
৩. টিমপেনিক পর্দা বা কর্ণপটহ	কর্ণকুহরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের মাঝে ব্যবধায়ক পর্দাবিশেষ।	শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে।
৪. কর্ণাস্থি : ম্যালিয়াস ইনকাস ও স্টেপিস	মধ্যকর্ণে অবস্থিত।	শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে।
৫. ককলিয়া	অন্তঃকর্ণে অবস্থিত শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো অস্থিময় প্রকোষ্ঠ বা নালিকাবিশেষ।	শ্রবণ অনুভূতি গ্রহণ করে ও মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
৬. অর্গ্যান অব কর্টি	ককলিয়ার বেসিলাস ঝিল্লির উপর অবস্থিত।	শব্দ-গ্রাহকযন্ত্ররূপে কাজ করে।
৭. ভেস্টিবুলার যন্ত্র	ককলিয়ার উপরের অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ ও মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ দিয়ে গঠিত।	ভারসাম্য রক্ষা করে।
৮. অর্ধবৃত্তাকার নালি	অন্তঃকর্ণে অবস্থিত তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি; ঝিল্লিময় ল্যাবিরিন্থের অন্যতম অংশ।	ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।
৯. ক্যুপুলা	অন্তঃকর্ণে অবস্থিত এক ধরনের চুননির্মিত কণিকাবিশেষ।	ভারসাম্য রক্ষা করে।
১০. ইউস্টেশিয়ান নালি	মধ্যকর্ণ ও গলবিলের সংযোগনালি।	মধ্যকর্ণ ও গলবিলস্থ বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical Coordination)

মানবদেহে যাবতীয় কাজে রাসায়নিক সমন্বয়কারী হিসেবে **হরমোন** (hormone) নামক এক জৈবরাসায়নিক পদার্থ ভূমিকা পালন করে। হরমোন উৎপন্ন হয় প্রধানত এক বিশেষ গ্রন্থিতন্ত্র থেকে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় **গ্রন্থি** (gland)। মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা ধরনের অসংখ্য গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করে।

গঠন ও কার্যগতভাবে বিশেষায়িত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, তাকে গ্রন্থি বলে। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থি দুধরনের-১. **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (Exocrine Glands) এবং ২. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine Glands)।

❒ **বহিঃক্ষরা বা সনাল গ্রন্থি :** যে সব গ্রন্থি নিজের ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থ নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরেই বহন করে, সেগুলোকে **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **রস** বা **জুস** (juice) বলে। যেমন-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অশ্রুগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি ইত্যাদি গ্রন্থি।

❒ **অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি :** যে সব গ্রন্থি নালিবিহীন, তাই ক্ষরণ সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সে সব গ্রন্থিকে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বা **অনাল গ্রন্থি** (ductless gland) বলে। উদাহরণ-পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল ইত্যাদি গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **হরমোন** বলে।

কিছু গ্রন্থি আছে যা একাধারে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। **অগ্ন্যাশয়** এমনি একটি গ্রন্থি। এ গ্রন্থির কিছু বিশেষায়িত কোষ (অন্তঃক্ষরা) থেকে **ইনসুলিন** ও **গ্লুকাগন** হরমোন উৎপন্ন ও রক্তে ক্ষরিত হয়। অন্যদিকে, এ গ্রন্থি থেকেই (বহিঃক্ষরা) **অগ্ন্যাশয়িক রস** উৎপন্ন হয়ে অগ্ন্যাশয়িক নালিতে বাহিত হয়ে অন্ত্রে পৌঁছায়।

অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১. সংজ্ঞা	মানবদেহে নালিবিহীন গ্রন্থিসমূহকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	মানবদেহে নালিযুক্ত গ্রন্থিসমূহকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২. নিঃসরণ	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম হরমোন।	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম রস, জুস, এনজাইম।
৩. পরিবহন	রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।	নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৪. ক্রিয়াস্থল	হরমোন দূরবর্তী টার্গেট স্থলে কাজ করে।	এটি নিকটবর্তী বা দূরবর্তী উভয় টার্গেট স্থলে কাজ করে।
৫. উদাহরণ	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।	যকৃত, ঘর্মগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি।
৬. চিত্র	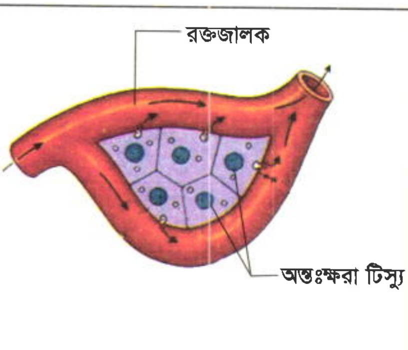	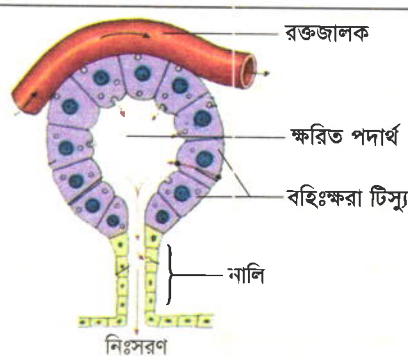

অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি (Endocrine Glands)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি **হরমোন** নামক জৈবরাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এটি নালিবিহীন গ্রন্থি হওয়ায় হরমোন সরাসরি রক্ত বা লসিকা প্রবাহে ক্ষরিত হয়। এসব গ্রন্থি রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ জালিকায় পরিবৃত থাকে।

নামকরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সূত্রপাত বেশ আগে থেকেই। এ বিদ্যার সূত্রপাত চীনদেশে। সেখানে খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে অভিনব উপায়ে মানুষের মূত্র থেকে যৌন ও পিটুইটারি হরমোন সংগ্রহ করে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতো। তবে সুনির্দিষ্টভাবে হরমোন (সিক্রেটিন) শনাক্ত করেন ১৯০২ সালে দুই ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ **Sir William Maddock Bayliss** এবং **Ernest Henry Starling**। তাঁরা ১৯০৫ সালে এ রাসায়নিককে **Hormone** নামে অভিহিত করেন। গ্রিক শব্দ *hormao* (to excite = উদ্দীপ্ত/ উত্তেজিত করা) থেকে হরমোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hormone)

হরমোন দেহের **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) হিসেবে সুপরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

১. এটি সাধারণত অন্তঃক্ষরাগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।
২. এটি প্রোটিনধর্মী বা ফ্যাটধর্মী (steroid হরমোন) জৈব যৌগ বিশেষ যা এক অঙ্গের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোন অঞ্চলের কোষসমূহের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. অধিকাংশ হরমোনই পানিতে দ্রবণীয় বলে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়।
৪. বিভিন্ন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরা প্রকৃতিতে প্রোটিন বা পেপটাইড বা স্টেরয়েড বা একটি বা দুটি অ্যামিনো এসিড ঘটিত জৈব পদার্থ।
৫. হরমোন অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় কার্যক্ষম কিন্তু এই ক্রিয়ার কার্যকাল বহুদিন পর্যন্ত বজায় থাকে।
৬. ক্ষরণকারী গ্রন্থি ছাড়া হরমোন কখনই দেহে জমা থাকে না।
৭. হরমোনের নির্দিষ্ট ক্রিয়াসম্পন্ন হওয়ার পর এরা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রেচন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নির্গত হয়।
৮. কয়েকটি হরমোন প্রাণিদেহে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রাখে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা, দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে একাধিক হরমোন অংশগ্রহণ করে।
৯. হরমোনের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভিটামিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।
১০. স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে হরমোন বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।
১১. হরমোন কোষে কোষে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে, তাই হরমোনকে **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) বলে।
১২. হরমোন সাধারণত ক্ষুদ্রতর অণু, তাই সহজেই এগুলো কোষঝিল্লি বা রক্তনালির অন্তঃস্থ আবরণী টিস্যুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

হরমোনের প্রকারভেদ (Types of Hormone)

উৎপত্তি ও কাজ অনুসারে হরমোন নিম্নোক্ত প্রকারের হতে পারে:

১. **ট্রপিক হরমোন (Tropic Hormone) :** যে হরমোন এক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে অন্য গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **ট্রপিক হরমোন** বলে। যেমন- TSH, ACTH, FSH ইত্যাদি।

২. **অটাকয়েড হরমোন (Autacoid Hormone) :** যে হরমোন উৎপত্তিস্থলে বা উৎপত্তিস্থলের কাছে ক্রিয়া করে, তাকে **অটাকয়েড** বা **স্থানিক হরমোন** বলে। যেমন- গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ইত্যাদি।

৩. **প্যারাক্রিন হরমোন (Paracrine Hormone) :** পরস্পর সংলগ্ন দুটি হরমোন ক্ষরণকারী কোষের একটির হরমোন যদি অপরটির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তাকে **প্যারাক্রিন হরমোন** বলে। যেমন- অগ্ন্যাশয়ের α-কোষ নিঃসৃত গ্লুকাগন হরমোন β-কোষের ইনসুলিন ক্ষরণ প্রভাবিত করে।

৪. **নিউরোহরমোন (Neurohormone) :** যে হরমোন নিউরন বা স্নায়ুকোষে সংশ্লেষিত হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের প্রান্ত থেকে নিঃসৃত হয়ে সরাসরি অন্য গ্রন্থিতে জমা হয় বা কাজ করে, তাকে **নিউরোহরমোন** বলে। যেমন- ADH, অক্সিটোসিন ইত্যাদি।

৫. **পাক-অন্ত্রীয় হরমোন (Gastrointestinal Hormone) :** পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তর থেকে নিঃসৃত যে সব হরমোন পরিপাক গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোকে একসাথে **পাক-অন্ত্রীয় হরমোন** বলে। যেমন- গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ইত্যাদি।

*** V.V.I.

ছক আকারে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও প্রধান কাজ দেখানো হলো

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	অংশ	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
MAT(20-21) ১. পিটুইটারি [অবস্থান-মস্তিষ্ক]	ক. অগ্রভাগ	i. বৃদ্ধিপোষক হরমোন (STH) (Growth hormone) ii. থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) iii লুটিনাইজিং হরমোন (LH) iv ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (FSH) v. প্রোল্যাকটিন (PRL) vi অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রিপিক হরমোন (ACTH) vii. মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন (MSH)	i. অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি; প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। ii. থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ। iii. নারীদেহে ডিম্বপাত ও দুগ্ধ ক্ষরণ এবং পুরুষে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ উদ্দীপ্ত করা। iv. ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা দান। v. স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। vi. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ। vii. মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
	খ. পশ্চাৎভাগ	i. অ্যান্টি ডাই-ইউরেটিক হরমোন (ADH) ii. অক্সিটোসিন MAT(9-10)	i. বৃক্কীয় নালির পানি পুনঃশোষণ ক্ষমতা এবং রক্তবাহিকার প্রাচীর সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ। ii. জরায়ু-সঙ্কোচন ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ।
২. পিনিয়াল [অবস্থান- মস্তিষ্কের ৩য় প্রকোষ্ঠে]		মেলাটোনিন	i. ঘুম-জাগরণ চক্র নিয়ন্ত্রণ। ii. যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানো।
৩. থাইরয়েড [অবস্থান-শ্বাসনালি] DAT(19-20)		i. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) ii. থাইরক্সিন (T_4) iii ক্যালসিটোনিন (CT)	i. বিপাক হার, হৃৎস্পন্দন ও প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। i. বিপাকীয় প্রক্রিয়া ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ii. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৪. প্যারাথাইরয়েড [অবস্থান-থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে]		i. প্যারাথরমোন (PTH) DAT(23-24)	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ। DAT(18-19), MAT(17-18)
৫. থাইমাস [অবস্থান-শ্বাসনালির নিচে]		i. থাইমোসিন	লিম্ফোসাইট প্রস্তুতি ও অ্যান্টিবডি গঠন।
৬. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস [অবস্থান-অগ্ন্যাশয়]		α i. ইনসুলিন β ii. গ্লুকাগন δ iii. সোমাটোস্ট্যাটিন PP iv. প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড	i. রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা কমানো। ii. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে তা বাড়ানো। iii. অগ্ন্যাশয়িক হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ। iv. খাদ্য গ্রহণের পর ক্ষরিত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করা।
৭. অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল [অবস্থান- প্রতিটি বৃক্কের ঊর্ধ্ব প্রান্তে]	ক. কর্টেক্স	i. গ্লুকোকর্টিকয়েড MAT(15-16) ii. মিনারেলোকর্টিকয়েড	i. শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ। ii. খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
	খ. মেডুলা	i. অ্যাড্রেনালিন বা এপিনেফ্রিন ii. নর-অ্যাড্রেনালিন বা নর-এপিনেফ্রিন iii. ডোপামিন	i. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্ত করে বিপাকীয় হার নিয়ন্ত্রণ, হৃৎগতি বৃদ্ধি ও দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ। ii. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ। iii. নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে।
৮. শুক্রাশয় [অবস্থান-পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহের স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে]		i. টেস্টোস্টেরন	পুরুষদেহের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো, গৌণ যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
৯. ডিম্বাশয় [অবস্থান-স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দুপাশে]		i. ইস্ট্রোজেন ii. প্রোজেস্টেরন	i. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা এবং রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ। ii. স্ত্রীদেহে গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

অন্তঃক্ষরা বা এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
(Location, Secretion and Function of Endocrine Glands)

হরমোন শুধু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষ থেকে নয় বরং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত কতকগুলো বিশেষায়িত কোষ থেকেও ক্ষরিত হয়। নিচে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

১. পিটুইটারি গ্রন্থি
২. পিনিয়াল গ্রন্থি
৩. থাইরয়েড গ্রন্থি
৪. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি
৫. অ্যাড্রিনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি
৬. থাইমাস গ্রন্থি
৭. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স
৮. গোনাড
৯. অমরা এবং
১০. বিভিন্ন টিস্যুস্থিত বিশেষায়িত কোষ।

নিচে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland)

পিটুইটারি গ্রন্থিকে হরমোন সৃষ্টিকারী প্রধান গ্রন্থি বা নিয়ন্ত্রক গ্রন্থি বা প্রভু গ্রন্থি (Principal / Master gland) বলে। কারণ একদিকে, পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি, অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গ্রন্থি।

অবস্থান ও আকৃতি : এ গ্রন্থি চোখের পিছনে মস্তিষ্কের তলদেশে (নিম্নভাগে) একটি ক্ষুদ্র বৃন্তের (ইনফান্ডিবুলাম) সাহায্যে যুক্ত থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থি প্রায় ১ সে.মি. ব্যাস সম্পন্ন লালচে ধূসর, দেখতে মটর দানার মতো, ০.৫ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট একটি গ্রন্থি।

পিটুইটারি গ্রন্থি দুটি খন্ডে বিভক্ত, যথা– **ক. অগ্র** বা **সম্মুখ পিটুইটারি** এবং **খ. পশ্চাৎ পিটুইটারি**।

ক. অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে নিচে উৎপন্ন ৭টি হরমোন উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে **প্রথম ৪টি ট্রপিক** (tropic) **হরমোন**। যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায় তাকে **ট্রপিক হরমোন** বলে।

১. **থাইরয়েড স্টিমুলেটিং (উদ্দীপক) হরমোন (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) :** থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরয়েড হরমোন (ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন, T_3 এবং থাইরোক্সিন, T_4) সংশ্লেষ ও ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

২. **অ্যাড্রিনো কর্টিকোট্রপিক হরমোন (Adreno Cortico Tropic Hormone, ACTH) :** অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

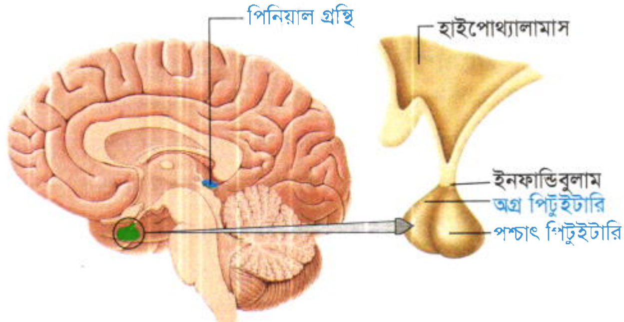

চিত্র ৮.৩৪ : মানুষের মস্তিষ্কে পিটুইটারি ও পিনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান

৩. **লুটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone, LH) :** নারীদেহে ডিম্বপাত, কর্পাস লুটিয়াম সৃষ্টি, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন সংশ্লেষকে উত্তেজিত করে। পুরুষে শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ ঘটায়।

৪. **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone, FSH) :** নারীদেহে ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা ও পরিপক্বতা দান করে এবং ইস্ট্রোজেন হরমোন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত হয়। পুরুষে শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণু উৎপাদনের সূত্রপাত ঘটে।

৫. **সোমাটোট্রপিক হরমোন (Somatotropic Hormone, STH) বা দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন (Growth Hormone, GH) :** কোমল টিস্যু ও অস্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন সংশ্লেষ, শর্করা বিপাক, স্নেহ পদার্থের বিপাক, খনিজ পদার্থের বিপাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপেশি ও অস্থি থেকে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন দূর করে। এ হরমোনের অত্যধিক ক্ষরণের ফলে মানুষ **দৈত্যাকৃতি** (gigantism) ধারণ করে এবং কম ক্ষরণের ফলে **বামনাকৃতি** (dwarfism) হয়।

৬. প্রোল্যাকটিন হরমোন (Prolactin Hormone, PRL) বা লুটিওট্রপিক হরমোন (Luteotropic Hormone, LTH) : স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি, দুগ্ধ উৎপাদন, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও পরিস্ফুটনের সময় রক্তকণিকা ও রক্তনালি সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

৭. মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulating Hormone–MSH) : এ হরমোন **মেলানোফোর** কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে চামড়া ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে দুটি হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. অক্সিটোসিন (Oxytocin) হরমোন : স্তনের পেশি সঙ্কোচন ঘটিয়ে দুগ্ধ ক্ষরণে সাহায্য করে ও প্রসবের সময় জরায়ুর সঙ্কোচন ত্বরান্বিত করে।

২. ভ্যাসোপ্রেসিন (Vasopressin) বা অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন (Anti Diuretic Hormone– ADH): রক্তচাপ বৃদ্ধি করে ও বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal Gland)

অবস্থান ও গঠন : একটি সরু বৃন্ত দিয়ে মস্তিষ্কের তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের পশ্চাৎ প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত, ক্ষুদ্র ও গোলাকার গ্রন্থি। এর দৈর্ঘ্য ৮-১২ মি.মি এবং প্রস্থ প্রায় ৮ মি.মি.।

কাজ : এ গ্রন্থি নিঃসৃত **মেলাটোনিন** (melatonin) হরমোন **ঘুম-জাগরণ চক্র** নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানোও এর কাজ।

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Gland)

অবস্থান ও আকৃতি : গ্রীবার সামনে স্বরযন্ত্রের নিচে ট্রাকিয়া সংলগ্ন থাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। প্রজাপতি সদৃশ্য বা ইংরেজি H আকৃতির থাইরয়েড গ্রন্থি দুটি খণ্ড নিয়ে গঠিত যারা **ইথমাস** (isthmus) নামক সংযোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। পরিণত মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির ওজন ২৫ গ্রাম। বিভিন্ন আকৃতির থাইরয়েড **ফলিকল** (follicles) দ্বারা গ্রন্থিটি গঠিত এবং যোজক টিস্যু ও রক্তনালি দিয়ে উক্ত ফলিকলগুলো পরস্পর থেকে পৃথক থাকে।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিচে বর্ণিত ৩টি সক্রিয় হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (Triiodothyronin, T_3) : মৌলিক বিপাক হারকে উদ্দীপ্ত করে; হৃৎস্পন্দন হার, প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন বিনাশ, গ্লুকোজ সংশ্লেষ, লাইপোলাইসিস প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করে। এ হরমোন ভ্রূণ ও শিশুর পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

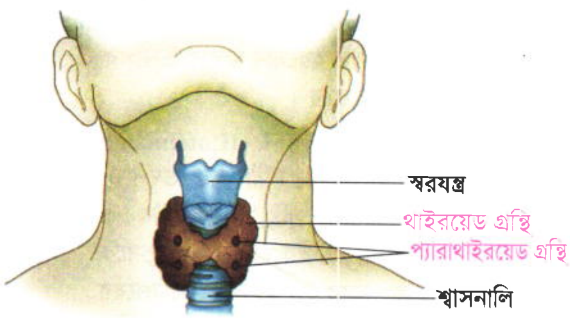

চিত্র ৮.৩৫ : থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান

২. থাইরক্সিন (Thyroxine, T_4) : বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন প্রোটিন সংশ্লেষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে দৈহিক বৃদ্ধি নির্ধারণ করে।

৩. ক্যালসিটোনিন (Calcitonin, CT) : এটি অস্থি থেকে Ca^{2+} রক্তে স্থানান্তরে বাধা দেয়ার মাধ্যমে Ca^{2+} এর মাত্রা কমায়; বৃক্ককে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দিয়ে মূত্রের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম মোচন করিয়ে রক্তে এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে; হাড়ে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের মাধ্যমে রক্তে Ca^{2+} এর মাত্রা ঠিক রাখে।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland)

অবস্থান ও আকৃতি : দুজোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে এবং আংশিকভাবে থাইরয়েডের মধ্যে অবস্থিত। এগুলো দেখতে ডিম্বাকার, অনেকটা ধানের দানার মতো। এ গ্রন্থির ওজন ৩০ মিলিগ্রাম এবং ব্যাস ৩-৪ মিলিমিটার।

নিঃসরণ : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনটি **প্যারাথাইরয়েড হরমোন** (Parathyroid Hormone, PTH) বা **প্যারাথরমোন** (Parathormone) বা **প্যারাথাইরিন** (Parathyrin) নামে পরিচিত।

ক্রিয়া : রক্তে Ca^{2+} এর পরিমাণ কমে গেলে প্যারাথরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। PTH নিম্নোক্ত উপায়ে রক্তে Ca^{2+} এর পরিমাণ বাড়ায়।

১. PTH সরাসরি হাড় থেকে Ca^{2+} কে রক্তে স্থানান্তর করার মাধ্যমে Ca^{2+} এর পরিমাণ বাড়ায়।

২. বৃক্কের ডিস্টাল টিউবিউল-এ Ca^{2+} এর পুনঃশোষণ বাড়ায়।

৩. বৃক্কে Vitamin D_3 কে সক্রিয় করে 1,25 ডাই হাইঅক্সি কোলেক্যালসিফেরল-এ পরিবর্তন করে যা অন্ত্রে ক্যালসিয়ামের শোষণ বাড়ায়।

স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহে ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া পেশির সংকোচন ও রক্ত জমাট বাঁধায়ও ক্যালসিয়ামের সঠিক মাত্রা প্রয়োজন। রক্তে ফসফেটের মাত্রা কমিয়ে দিতে এবং ভিটামিন D-কে সক্রিয়করণে প্যারাথরমোন ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন D-র অভাবে বাচ্চাদের **রিকেটস** (rickets) রোগ দেখা দেয়। বয়স্কদের হয় **অস্টিওম্যালাসিয়া** (osteomalacia)।

অ্যাড্রিনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal or Supra-renal Gland)

অবস্থান ও আকৃতি : প্রত্যেক বৃক্কের মাথায় টুপির মতো একটি করে মোট দুটি **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি** থাকে। প্রতিটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি প্রায় ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ৩ সেন্টিমিটার প্রশস্ত এবং ১ সেন্টিমিটার পুরুত্ববিশিষ্ট। পরিণত মানুষের দুটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির ওজন ৭-১০ গ্রাম। প্রত্যেক গ্রন্থির বাইরের হলুদ অংশকে **কর্টেক্স** (cortex) এবং ভিতরের পিঙ্গল বর্ণের অংশকে **মেডুলা** (medulla) বলে।

নিঃসরণ : অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির উভয় অংশ থেকেই হরমোন ক্ষরিত হয় এবং এদের কাজও ভিন্ন।

ক. কর্টেক্স নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিচে বর্ণিত তিন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়–

১. **গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoids) :** এটি শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন– Cortisol (কর্টিসল)।

২. **মিনারেলোকর্টিকয়েড (Mineralocorticoids) :** এটি খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– Aldosterone (অ্যালডোস্টেরণ)।

৩. **গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoids):** এটি ভ্রূণের যৌন ভিন্নতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌন গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ ও গৌণ বা সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। যেমন– Estrogen (এস্ট্রোজেন)।

খ. মেডুলা নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রিনাল মেডুলা থেকে ২টি হরমোন নিঃসৃত হয়:

১. **অ্যাড্রিনালিন (Adrenalin) :** এর অপর নাম **এপিনেফ্রিন** (Epinephrine)। যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত (গ্লাইকোজেনোলাইসিস) করে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনির অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২. **নর অ্যাড্রিনালিন (Nor adrenalin) :** এর অপর নাম **নরএপিনেফ্রিন** (Nor epinephrine)। দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

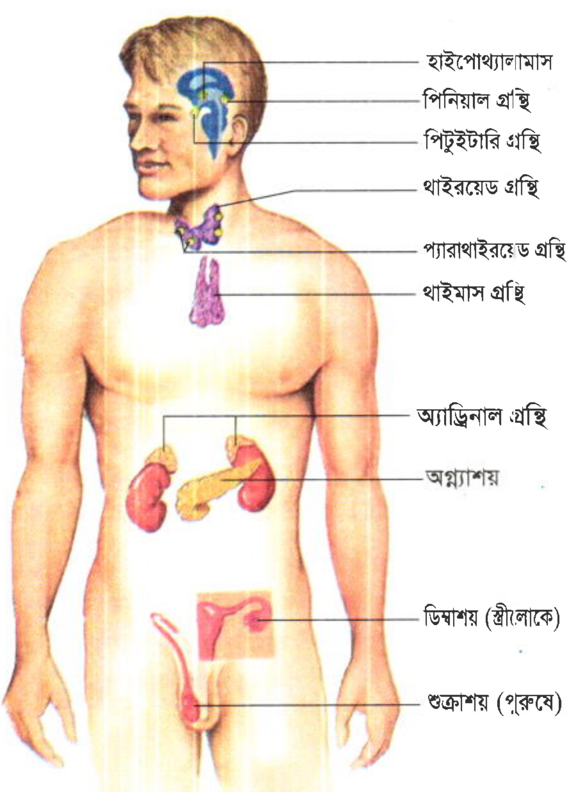

চিত্র ৮.৩৬ : মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

থাইমাস গ্রন্থি (Thymus Gland)

এটি ঊর্ধ্ব বক্ষে শ্বাসনালির গোড়ায় অবস্থান করে। এটি কোমল, ফ্যাকাশে লাল বর্ণের, দুটি খণ্ড বিশিষ্ট এবং লিম্ফয়েড টিস্যু নির্মিত। শৈশবে এটি বড় থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এর আকার ক্রমশ ছোট হতে হতে এক সময় আণুবীক্ষণিক হয়ে যায়।

কাজ : এটি **থাইমোসিন** (thymosin) নামক একটি প্রোটিন জাতীয় হরমোন ক্ষরণ করে। এর কাজ: (i) এটি রক্তে লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সহায়তা করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; (ii) শৈশবে কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করে দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুততর করে।

থাইমাস গ্রন্থি দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় বার্ধক্য দশায় এর হ্রাসপ্রাপ্তি মানুষকে রোগজীবাণু ও ক্যান্সারের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। থাইমাস গ্রন্থি মূলত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষয়ীভবন ত্বরান্বিত করে। তাই বার্ধক্য প্রাপ্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।

অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans in Pancreas)

আকৃতি ও অবস্থান : অগ্ন্যাশয় একটি **মিশ্রগ্রন্থি**। বহিঃক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত কিছু কোষগুচ্ছ একেকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এগুলো **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স**। আবিষ্কারক Pauel Langerhans (1869)-এর নামানুসারে এ কোষগুচ্ছ "আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস" নামে পরিচিত। এসব গ্রন্থিকোষের সম্মিলিত আয়তন মোট অগ্ন্যাশয় আয়তনের ১–২%। প্রতিটি দ্বীপগ্রন্থির কোষ দানাদার, বহুভুজাকার ও রক্তবাহিকা সম্বলিত। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স চার ধরনের কোষে গঠিত : (১) আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন, MAT(14-15) (২) **বিটা কোষ** থেকে **ইনসুলিন**, (৩) **ডেল্টা কোষ** থেকে **সোমাটোস্ট্যাটিন** হরমোন নিঃসৃত হয় এবং (৪) **PP কোষ** থেকে **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** ক্ষরিত হয়। এদের কাজ নিম্নরূপ–

১. গ্লুকাগন (Glucagon) : (i) এটি যকৃতের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ উৎপাদনে (গ্লাইকোজেনোলাইসিস) সহায়তা করে; (ii) অ্যামিনো এসিড ও ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে (গ্লুকোনিওজেনেসিস) সহায়তা করে; (iii) রক্ত-শর্করার মাত্রা বাড়ায়; (iv) স্নেহ পদার্থের ভাঙ্গনে (লাইপোলাইসিস) সহায়তা করে।

২. ইনসুলিন (Insulin) : (i) এটি কোষে গ্লুকোজের অনুপ্রবেশ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে। (ii) যকৃত ও পেশিকোষে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ (গ্লাইকোজেনেসিস) ও সঞ্চয় হার বৃদ্ধি করে। (iii) রক্ত-শর্করার মাত্রা কমায়; (iv) গ্লুকোনিওজেনেসিস ও কিটোন বডি উৎপাদন রোধ করে এবং (v) মেদ টিস্যুতে ফ্যাট সংশ্লেষণ ও সঞ্চয় ত্বরান্বিত করে। এর অভাবে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** রোগ হয়।

৩. সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) : (i) এটি GH, ইনসুলিন ও গ্লুকাগন বিরোধী হিসেবে কাজ করে; (ii) GH বিরোধী হিসেবে এটি দেহের যথাযথ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; (iii) পৌষ্টিকনালির পুষ্টিপদার্থের পরিশোষণ হার হ্রাস করে।

৪. প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic Polypeptide) : অধুনা আবিষ্কৃত এ হরমোনের কাজ হলো খাদ্য গ্রহণের পর এটি ক্ষরিত হয় এবং ক্ষুধা হ্রাস করে। এ হরমোন প্রয়োগে স্থূলতা (obesity) প্রতিরোধের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus or Diabetes) : অগ্ন্যাশয়ের বিটা (β) কোষ যখন যথেষ্ট পরিমাণ **ইনসুলিন** উৎপন্ন করতে পারে না অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** বা **ডায়াবেটিস** বলে। এ অবস্থায় রক্তে অতিরিক্ত শর্করার (গ্লুকোজ) উপস্থিতির কারণে নানারকম শারীরিক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

গোনাড বা জননাঙ্গ (Gonad)

জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে **গোনাড** বা **জননাঙ্গ** বলে। গোনাড দুধরনের– **শুক্রাশয়** ও **ডিম্বাশয়**। এগুলো গ্রন্থিরূপী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নয় কিন্তু এসব অঙ্গের কিছু অন্তঃস্থ টিস্যু **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** হিসেবে কাজ করে। পুরুষ ও নারীদেহে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় রয়েছে।

❐ শুক্রাশয় (Testis)

অবস্থান : শুক্রাশয় পুংপ্রজননতন্ত্রের একটি অংশ। দুই উরুর মাঝে স্ক্রোটামের ভিতর দেহগহ্বরের বাইরে।

নিঃসরণ : শুক্রাশয় থেকে **টেস্টোস্টেরন** (testosteron) নামক পুরুষ হরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ : (i) পুংজননতন্ত্রের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। (ii) শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। (iii) আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) শুক্রাণুর সক্রিয়তা ও নিষেক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। (v) ফ্যাটি এসিড সংশ্লেষণের হার বাড়ায় এবং (vi) তেলগ্রন্থির ক্ষরণকে প্রভাবিত করে।

❐ ডিম্বাশয় (Ovary)

অবস্থান: স্ত্রীজননতন্ত্রের অংশ, শ্রোণির পিছনের ফাঁপা গহ্বরে জরায়ুর দুপাশে ইউরেটারের নিচে।

নিঃসরণ : প্রধানত দুই প্রকার স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরিত হয়-

১. ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) হরমোন

কাজ : (i) বিভিন্ন যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। (ii) রজঃচক্র এবং স্তনের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। (iii) অগ্র-পিটুইটারি থেকে গ্রোনাডোট্রপিক হরমোনের ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) জরায়ুর টিস্যুতে দ্রুত হারে RNA সংশ্লেষণ ঘটায় এবং (v) প্লাজমায় কোলেস্টেরল ও অন্যান্য লিপিডের পরিমাণ কমায়।

২. প্রোজেস্টেরন (Progesteron) হরমোন

কাজ : (i) জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামকে সুগঠিত করে যা নিষিক্ত ডিম্বাণু ধারণের উপযুক্ত হয়। (ii) রজঃচক্র, ডিম্বাণু উৎপাদন এবং লুটিনাইজিং হরমোন উৎপন্নে বাধা দেয়। (iii) ডিম্বাশয় চক্রে একাধিক ডিম্বাণু সৃষ্টি বাধাগ্রস্থ করে।

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

অমরা গর্ভবতী মহিলার জরায়ুর অন্তর্গাত্রে অবস্থান করে। এটি হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (hCG), হিউম্যান কোরিওনিক সোমাটোট্রপিন (hCS), রিলাক্সিন ও প্রোল্যাক্টিন নামক ৪টি প্রোটিন জাতীয় হরমোন এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নামক ২টি স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণ করে।

কাজ : (i) **hCG ও hCS** গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে এবং গর্ভাবস্থায় মাতৃদেহ ও ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। (ii) **রিলাক্সিন** গর্ভাবস্থার শেষে সন্তান প্রসবে সহায়তা করে। (iii) **প্রোল্যাক্টিন** গর্ভাবস্থায় মাতৃস্তন গ্রন্থিতে দুগ্ধ উৎপাদনে সহায়তা করে। (iv) **ইস্ট্রোজেন** ওভারিয়ান ইস্ট্রোজেনের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে এবং (v) প্রোজেস্টেরন ওভারিয়ান প্রোজেস্টেরনের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands and Intestinal Glands)

এ গ্রন্থিগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত।

১. গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলির প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়ে HCl ও পেপসিন নিঃসরণে উদ্দীপনা জাগায়।

২. সিক্রেটিন (Secretin) : অন্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়ে অগ্ন্যাশয় রস, পিত্তক্ষরণে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

৩. কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং পিত্তথলি থেকে পিত্তরস ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়।

৪. এন্টেরোক্রাইনিন (Enterocrinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়ে বিভিন্ন আন্ত্রিক এনজাইমের ক্ষরণকে সহায়তা করে।

৫. গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড (Gastric Inhibitory Peptide, GIP) : ডিওডেনাম ও জেজুনামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলি থেকে অন্ত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এ হরমোনের কাজ।

৬. ডিওক্রাইনিন (Duocrinin) : পাকস্থলিতে খাদ্যের উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডিওডেনাল মিউকোসায় উৎপন্ন হয়। এটি গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে জড়িত এবং এতে প্রদাহ-বিরোধী ও অ্যান্টি-আলসার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৭. ভিলিকাইনিন (Villikinin) : ভিলিকাইনিন হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ক্ষরিত একটি পেপটাইড হরমোন যা অন্ত্রের গতিশীলতা ও নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব (Effect of Hormones in the Growth of the Body)

মানবদেহের বৃদ্ধিতে দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে। একটি হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত **গ্রোথ হরমোন** (Growth Hormone, GH) এবং অন্যটি থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **থাইরক্সিন** (Thyroxine)।

দেহের বৃদ্ধিতে গ্রোথ হরমোনের ভূমিকা

গ্রোথ হরমোন বা **সোমাটোট্রপিক হরমোন** বা **সোমাটোট্রপিন** ১৯১টি অ্যামিনো এসিড নিয়ে গঠিত এক শিকল বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু। মানুষের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিতে এ হরমোন প্রধান ভূমিকা রাখে বলে একে **গ্রোথ হরমোন** বলা হয়। মানুষের বৃদ্ধিজনিত অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ এ হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন–

১. **পেশির বৃদ্ধি :** এ হরমোনের প্রভাবে প্রোটিন পরিপাকের ফলে সৃষ্ট সরল ও তরল অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয় ও এদের গ্রহণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, কোষে প্রোটিন সংশ্লেষের হার বেড়ে যায় ও পেশির বৃদ্ধি সাধন ঘটে।

২. **দেহের ক্ষয়রোধ :** সাধারণত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থায় গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দেহের ক্ষয় রোধ হয়।

৩. **কঙ্কালতন্ত্রের বৃদ্ধি :** তরুণাস্থির আয়তন বৃদ্ধি, অস্টিওব্লাস্টের আবির্ভাব, অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয়, কনড্রিওসাইট ও অস্টিওসাইটের পূর্ণতা প্রাপ্তি ইত্যাদি সব কার্যক্রম এ হরমোন দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. **আয়ন বৃদ্ধি :** এ হরমোনের প্রভাবে খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন আয়ন বিশেষ করে **ক্যালসিয়াম আয়ন** পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত হয় এবং বৃক্ক থেকে বিভিন্ন আয়ন শোষণের মাধ্যমে দেহে আয়ন বৃদ্ধি ঘটায়। এসব আয়ন দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

৫. **দুগ্ধ উৎপাদন :** এ হরমোন স্তনগ্রন্থিকে পর্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপাদনে প্রভাবিত করে ফলে শিশু দুগ্ধ পান করে দৈহিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৬. **লোহিত কণিকা সৃষ্টি :** এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লোহিত কণিকা O_2 পরিবহন করে বিপাক ক্রিয়ার হার বাড়িয়ে দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭. **ওষুধ হিসেবে ব্যবহার :** শিশুদের অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের হরমোন স্বল্পতার চিকিৎসায় গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বৃদ্ধ হওয়া ও স্থূলতা রোধে **গ্রোথ হরমোন থেরাপি** ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৮. **অস্বাভাবিক নিঃসরণ :** দেহে অস্বাভাবিক গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের কারণে মানবদেহে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন–

ক. **বামনত্ব (Dwarfism) :** শিশুকালে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ না হলে মানুষ বামন হয়। এদের প্রাপ্ত-বয়স্ক উচ্চতা ১২২ সেন্টিমিটার (৪ ফুট)-এর নিচে থাকে।

খ. **দৈত্যত্ব (Gigantism) :** শিশুকালে অস্থি গঠনের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষ দৈত্যাকৃতির হয়।

গ. **গরিলাত্ব (Acromegaly) :** বয়স্ক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে মানুষের হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গরিলার মতো রূপ ধারণ করে। একে **এক্রোম্যাগালি** (acromegaly) বলে।

দেহের বৃদ্ধিতে থাইরক্সিন হরমোনের ভূমিকা

থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন** হরমোন মানবদেহের বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে–

১. পিটুইটারি গ্রন্থিকে **গ্রোথ হরমোন** ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে এবং গ্রোথ হরমোনের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
২. প্রোটিন সংশ্লেষের হার বাড়িয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।
৩. কঙ্কালপেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. বিভিন্ন টিস্যুর বিভেদ ও পরিপক্কতার জন্য এটি আবশ্যক।
৫. সকল ধরনের খাদ্যের বিপাক হার বৃদ্ধি করে যা দেহের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।
৬. এ হরমোন নিউরনের বিকাশ ও পূর্ণতা এবং মায়েলিন আবরণ সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।
৭. এ হরমোন তরুণাস্থির বিভেদন ও পরিপক্কতার জন্য অত্যাবশ্যক। এটি অস্থির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটায়।

৮. এটি লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রজননতন্ত্র ও পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৯. অতিরিক্ত বা অল্প থাইরক্সিন ক্ষরণ উভয়ই দেহের জন্য ক্ষতিকর। দেহে অতিরিক্ত থাইরক্সিন ক্ষরণ (hyperthyroidism) হলে **গয়টার** (goitre) বা **গলগণ্ড** রোগ হয়। আবার কম থাইরক্সিন ক্ষরণ (hypothyroidism) হলে শিশুদের **ক্রিটিনিজম** (cretinism) এবং বয়স্কদের **মিক্সিডেমা** (myxedema) রোগ হয়।

দৈহিক বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের প্রভাব

মানবদেহের বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। যেমন–

১. ইনসুলিন হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং গ্লাইকোজেন আকারে যকৃতে ও পেশিতে জমা রাখতে সাহায্য করে যা বিপাকীয় ক্রিয়ায় তাপ শক্তিতে পরিণত হয়ে দেহ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২. কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন শর্করা, চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বিপাকে প্রভাব বিস্তার করে দেহ গঠনে ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটে ও দুগ্ধক্ষরণ হয়, ফলে শিশুদের দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৪. সেক্স স্টেরয়েড হরমোনের প্রভাবে আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়।

এছাড়া গ্রোথ রিলিজিং হরমোন, ক্যালসিটোনিন ইত্যাদি হরমোনও দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

শারীরবৃত্তীয় কাজে হরমোনের প্রভাব

১. খাদ্য পরিপাক : পৌষ্টিকনালির অন্তঃক্ষরা কোষ থেকে নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ও কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোন পরিপাক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজাইমগুলোর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. শর্করা বিপাক : থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক করে।

৩. প্রোটিন বিপাক : থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও খনিজ আয়ন বিপাক এবং টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

MAT(9-10), DAT(16-17), (21-22)

৪. হৃৎক্রিয়া ও রক্তচাপ : এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন হরমোন হৃৎক্রিয়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৫. আয়ন সমতা রক্ষা : অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন Na^+, K^+ আয়নের সমতা রক্ষা করে।

৬. বিপাক নিয়ন্ত্রণ : স্টেরয়েডধর্মী হরমোনগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে, গ্রোথ হরমোন ফ্যাটকে শক্তি উৎপাদনে প্রভাবিত করে।

৭. পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : ADH হরমোন পানি শোষণ ও পানিসাম্য বজায় রাখে।

৮. লোহিত কণিকা উৎপাদন : বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৯. প্রজনন : ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোজেস্টেরন জরায়ুর প্রাচীরে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়, টেস্টোস্টেরন **শুক্রাণুজনন** (spermatogenesis)-এ শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

১০. সন্তান প্রসব : প্রসবের সময় রিলাক্সিন শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অক্সিটোসিন জরায়ুর সংকোচন ঘটিয়ে প্রসব ত্বরান্বিত করে।

১১. বয়ঃসন্ধি : টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১২. দুগ্ধক্ষরণ : গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন সন্তান প্রসবকারী মায়ের স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১৩. দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ : মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে গায়ের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪. রোগ প্রতিরোধ : থাইমোসিন হরমোন লিম্ফোসাইটের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব

মানবদেহের যে কোনো আচরণের রহস্য উদঘাটনে অবাক হতে হয় কতো নিখুঁত, সঠিক ও পরিমিত হরমোনের মিশ্রণে দেহ পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্যে রয়েছে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। জীবনের প্রত্যেক ধাপে বিভিন্ন উপায়ে নারী, পুরুষ ও শিশুদেহের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব রয়েছে।

নারীদের আচরণগত পরিবর্তন

১. রজঃচক্র চলাকালীন সময় নারীর দেহের কিছু হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নারীদের মধ্যে পুরুষের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার প্রবণতা বেড়ে যায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় ইত্যাদি। সাধারণত নারীর দেহে ডিম্বপাতের সময় এগিয়ে আসলে এ ধরনের আচরণ করে থাকে।

২. রজঃচক্র বন্ধকালীন সময় এগিয়ে আসলে ডিম্বাশয়ে প্রোজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোন কম মাত্রায় ক্ষরিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নারীরা অল্প কিছুতে রেগে যায়, ঘুম ঠিকমতো হয় না, অনেকে আবার বিষণ্নতায় ভুগে থাকে।

৩. গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন–hCG (Human Chorionic Gonadotropin), প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন ইত্যাদি হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেখা যায় অনেকে অল্পতে রেগে উঠে, হঠাৎ কেঁদে ফেলে ইত্যাদি নানান পরিবর্তন দেখা যায়।

৪. অনেক সময় দেখা যায় সন্তান প্রসবের পর হরমোন ক্ষরণের তারতম্যের জন্য নারীরা নানান মানসিক রোগে ভোগে। একে **প্রসবোত্তর সাইকোসিস** বলে।

পুরুষদের আচরণগত পরিবর্তন

১. টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে গেলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

২. অতিরিক্ত টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণে স্বভাবে হিংস্রতা সৃষ্টি হয় এবং শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

৩. টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমে গেলে বিষন্নতায় ডুবে যায়।

৪. শুক্র নিবৃত্তি বা অ্যান্ড্রোপজের সময় কাছে চলে আসলে যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যায়।

শিশুদের আচরণগত পরিবর্তন

শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় উপনীত হয় তখন হরমোনের আচরণগত প্রভাব স্পষ্ট হয়। **হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন নারী-পুরুষে বিভিন্ন পরিবর্তন নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।**

অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল (Result of Uncontrolled Use of Hormone)

দেহ সচল, কর্মক্ষম রাখতে অতি অল্প ও নির্দিষ্ট পরিমাণ হরমোন দেহে প্রয়োজন হয়। কারও দেহে পরিমিত হরমোন ক্ষরিত না হলে নানা জটিল অবস্থা দেখা দিয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট হরমোন ব্যবহার করতে হয়। হরমোনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কষ্টদায়ক জীবনের অবসান ঘটালেও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারটি উল্টো ফল বয়ে আনে। নিচে কয়েকটি প্রধান হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল উলেখ করা হলো।

১. **গ্রোথ (বৃদ্ধি) হরমোন :** বামনত্ব ও অ্যাক্রোমিক্রিয়া রোগের চিকিৎসায় গ্রোথ হরমোনের ব্যবহার হয়। এছাড়া প্রাডের উইলি সিনড্রোম ও টারনার সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত রোগীদের কিছু শারীরিক ও বিপাকীয় অসুবিধা দূরীকরণেরও এর ব্যবহার রয়েছে। তবে এর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিন্ড বড় হওয়ার জন্য হার্ট ফেইলিউর, অস্বাভাবিক অস্থি বৃদ্ধি, পেশি ফুলে যাওয়ায় সন্ধি ব্যথা, ডায়াবেটিস, অ্যাক্রোমেগালি, কার্পাল টানেল সিনড্রোম ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

২. **থাইরক্সিন :** থাইরক্সিনের স্বল্পতা পূরণে যে সংশ্লেষিত হরমোন (Levothyroxine) ব্যবহার করা হয় তাতে কেবল থাইরয়েড হরমোন স্বল্পতাই পূরণ হয় না, সে সঙ্গে থাইরয়েড ক্যান্সার এবং গলগণ্ড প্রতিরোধেও সহায়ক হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যবহার হলে যে সব জটিলতা দেখা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ছদ্ম-গলগন্ড হতে পারে; তা ছাড়া দ্রুত হৃৎস্পন্দন, উদরীয় ব্যথা, চিন্তাগ্রস্ততা খিটখিটে মেজাজ, ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধাবৃদ্ধি প্রভৃতি। অ্যালার্জিক

প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস নেয়া এবং মুখমন্ডল ও জিহ্বা ফুলে যাওয়া। হার্ট ফেইলিউর এবং রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস মাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটা।

৩. এপিনেফ্রিন (অ্যাড্রিনালিন) : ফুসফুসের ভিতরে বাতাস চলাচলের নালি খুলতে, রক্তবাহিকা সংকীর্ণ করতে এবং বিভিন্ন মারাত্মক অ্যালার্জিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে সংশ্লেষিত এপিনেফ্রিন ব্যবহৃত হয়। তবে অতিমাত্রায় ব্যবহার হলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ, সঙ্গে মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, দুঃশ্চিন্তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বুকব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, হঠাৎ দুর্বলতা, কথাবলা বা হাঁটাচলায় ভারসাম্যহীনতা, ঘনঘন শ্বাস নেয়া প্রভৃতি।

৪. টেস্টোস্টেরন : এটি পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হরমোন। এর স্বাভাবিক ক্ষরণে পুরুষ যৌনাঙ্গ সুগঠিত রাখে, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে পৌরুষ প্রদর্শন করে। বড়ি বা ইনজেকশনের মাধ্যমে টেস্টোস্টেরনের অভাব পূরণে ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু এর অতিব্যবহারে প্রথমে দুর্বলতা, নিদ্রালুভাব, গায়েব্যথা, চামড়ায় জ্বালাপোড়া ভাব, মনোযোগহীনতা, হাত-পায়ের আঙ্গুল ঠান্ডা হয়ে আসা ইত্যাদি দেখা দেয়। পরে শুক্রাশয়ে ব্যথা, দ্রুত বা মন্থর হৃৎস্পন্দন, রক্তময় মলত্যাগ, মূত্রথলিতে ব্যথা, পিঠের দুপাশে বা মাঝখান ধরে ব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৫. ইস্ট্রোজেন : ইস্ট্রোজেন নারীদেহের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পরিমিত ইস্ট্রোজেন নারীদেহকে সুস্থ, সবল ও সুদর্শনা রাখে। কোনো কারণে দেহে অপর্যাপ্ত হরমোন উৎপন্ন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইস্ট্রোজেনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এসব সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে নারী বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে, যেমন- স্তন দৃঢ় হয়ে যাওয়া, ঢুলুঢুলুভাব, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, মাথাব্যথা, মানসিক ভাবের পরিবর্তন, বমিভাব, ত্বকে ফুসকুড়ি, মূত্রের রং পরিবর্তন ইত্যাদি।

৬. ইনসুলিন : আজকাল অনেকেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিয়ে জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এর ব্যবহার কঠোর নিয়ন্ত্রণে না থাকলে নতুন নতুন জটিলতায় ভোগার আশঙ্কা থাকে, যেমন হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অবসাদ, ঢুলুঢুলুভাব, মাথাব্যথা, ক্ষুধা, মনযোগে ব্যর্থ হওয়া, বমিভাব, স্নায়ুদৌর্বল্য, ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, ঘুমে ব্যঘাত, খিঁচুনি, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে তুলনা (Comparison between Enzyme & Hormone)

(ক) মিল/সাদৃশ্য : (i) উভয়ে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ (ii) উভয়েই গ্রন্থি কর্তৃক নিঃসৃত হয় (iii) উভয়েই জীবদেহের বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(খ) অমিল/পার্থক্য :

হরমোন ও এনজাইমে পার্থক্য Reading	
হরমোন (Hormone)	**এনজাইম (Enzyme)**
১. নালিহীন (endocrine) গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।	১. নালিযুক্ত (exocrine) গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।
২. রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।	২. নিজস্ব নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় না এবং কাজের শেষে বিনষ্ট হয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।	৩. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় এবং রাসায়নিক অনুঘটকের মতো বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে।
৪. কার্যপদ্ধতি ধীরগতিসম্পন্ন, দীর্ঘস্থায়ী এবং ফল সুদূরপ্রসারী।	৪. কার্য পদ্ধতি দ্রুত ও ফল তাৎক্ষণিক।
৫. উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী অংশে কার্যক্ষম।	৫. সাধারণত উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী কোনো স্থানে সক্রিয়।
৬. বিভিন্ন বয়সে বা জীবনের ভিন্ন দশায় রকমফের দেখা যায়।	৬. সব বয়সে একই রকম এনজাইম দেখা যায়।
৭. উদাহরণঃ থাইরক্সিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।	৭. উদাহরণ ঃ অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

মানুষের কয়েকটি হরমোন ঘটিত রোগের নাম, কারণ ও লক্ষণ VVI		
রোগের নাম	**কারণ**	**লক্ষণ**
১. ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)	ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া।	রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেকটা বেড়ে যায় (হাইপার-গ্লাইসেমিয়া) এবং মূত্রে গ্লুকোজ রেচিত হয় (গ্লাইকোসুরিয়া)।
২. বামনত্ব (Dwarfism)	কম বয়সে গ্রোথ হরমোনের (GH) ক্ষরণ কম হওয়া।	দেহ খর্বাকায়, তবে বুদ্ধিমত্তা ও জননতন্ত্রের বৃদ্ধি বয়সোচিত।
৩. অ্যাক্রোমিক্রিয়া (Acromicria)	প্রাপ্ত বয়স্কে গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া।	দেহক্ষয় ও অকাল বার্ধক্য।
৪. জাইগ্যান্টিজম (Gigantism)	বয়ঃসন্ধিকালে গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	দেহ বিশাল আকার ধারণ করে। তাছাড়া হাইপার-গ্লাইসেমিয়া ও গ্লাইকোসুরিয়া ঘটতে দেখা যায়।
৫. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes incipidus)	ADH/ভেসোপ্রেসিন হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া।	দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে লঘু মূত্র রেচিত হয়, মূত্রে গ্লুকোজ থাকে না, রক্তচাপ বাড়ে, রক্ত-শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।
৬. অ্যাক্রোমেগালি/মারিজ ব্যাধি (Acromegaly/ Marie's disease)	প্রাপ্ত বয়স্কে গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ খুব বেশি হওয়া।	দেহ অনেকটা গরিলার মতো হয়, এক্ষেত্রে ব্যক্তির কপাল, নাক, খুলি, নিচের চোয়াল, হাত, আঙ্গুল ইত্যাদি অস্থির আকার ও স্থূলত্ব অনেক বেড়ে যায়।
৭. কুশিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome)	গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	পেশি ক্ষয়, পেশি দৌর্বল্য; মুখমণ্ডল, পেট ও ঘাড়ে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চয়, হাইপারগ্লাইসেমিয়া ও গ্লাইকোসুরিয়া।
৮. অ্যালডোস্টেরোনিজম (Aldosteronism)	অ্যালডোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের বাইরের দিকে টিউমার সৃষ্টি, পেশির অবসাদ ও খিঁচুনি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, রক্ত প্লাজমায় Na^+ বৃদ্ধি ও K^+ হ্রাস।
৯. অ্যাড্রিনাল ভিরিলিজম (Adrenal Virilism)	বয়স্ক স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সেক্সকর্টিকয়েড হরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	মুখমণ্ডল, দেহ ও গলার স্বর পুরুষের মতো হয়, গোঁফ ও দাঁড়ি গজায়।
১০. ইউনুচোইডিজম (Eunuchoidism)	টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ কম হওয়া।	গৌন যৌন বৈশিষ্ট্য ও যৌনাঙ্গসমূহ অবিকশিত থাকে।
১১. টিট্যানি (Tetany)	প্যারাথরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া।	পেশি খিঁচুনি।
১২. অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis)	প্যারাথরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম অপসারণ, ফলে অস্থি ছিদ্রময় ও ভঙ্গুর হয়, বৃক্ক-পাথুরির সৃষ্টি হয়।
১৩. ক্রেটিনিজম (Cretinism)	শৈশবকালে থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া।	দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়; হাড় ও দাঁতের গঠনে ত্রুটি দেখা দেয়; দেহচর্ম খসখসে ও ভাঁজযুক্ত হয়; মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়; শিশু হাবা গোবা হয়।
১৪. মিক্সিডেমা (Myxoedema)	বয়স্কদের ক্ষেত্রে থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া (সাধারণত স্ত্রীলোকেরা এ রোগে আক্রান্ত হয়।)	মুখমণ্ডল ও দেহে শোথ-এর মতো স্ফীতি দেখা দেয়, ত্বক পুরু ও খসখসে হয়, বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়।
১৫. সাধারণ গলগণ্ড (Simple Goitre)	খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে থাইরক্সিনের ক্ষরণ কম হওয়া।	থাইরয়েড গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি এবং গলাফোলা।
১৬. গ্রেভ-এর রোগ/এক্সঅপথ্যালমিক গলগণ্ড (Grave's disease/ Exopthalmic Giotre)	থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ বেশি হওয়া।	দৈহিক ওজন হ্রাস, হৃৎস্পন্দন হার ও রক্তচাপ বৃদ্ধি, গলগণ্ড ও অক্ষিগোলকের স্ফীতি।
১৭. এডিসনের রোগ (Addison's disease)	গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন ক্ষরণ কম হওয়া।	দৈহিক ওজন হ্রাস, ক্ষুধামান্দ্য, মানসিক অবসাদ, রক্ত-শর্করার মাত্রা হ্রাস, রক্তচাপ হ্রাস।

Must Know

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. স্নায়ুকোষ বা নিউরন দিয়ে গঠিত যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণিদেহে উদ্দীপনা গ্রহণ, উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

২. বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমন্বয় বলে। সমন্বয় ব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা- স্নায়বিক সমন্বয় ও রাসায়নিক সমন্বয়। স্নায়বিক সমন্বয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ও রাসায়নিক সমন্বয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

৩. করোটির মধ্যে সুরক্ষিত মেনিনজেস পর্দাবেষ্টিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ সিসি. গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) নিউরন ও ১ বিলিয়ন (একশত কোটি) নিউরোগ্লিয়া কোষ থাকে।

৪. মেনিনজেস নামক তিনটি তন্তুময় পাতলা পর্দা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আবৃত থাকে। মেনিনজেসে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে মেনিনজাইটিস বলে।

৫. পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকৃতি ও পরিবর্তন অনুধাবনে সক্ষম ইন্দ্রিয়গুলোকে সংবেদী অঙ্গ বলে। মানবদেহের সংবেদী অঙ্গগুলো হচ্ছে– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

৬. যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে।

৭. যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন থেকে অন্য নিউরন কিংবা পেশিকোষ কিংবা কোনো গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের নিউরোট্রান্সমিটার বলে।

৮. চক্ষুগোলকের সবচেয়ে ভিতরের স্তর হচ্ছে রেটিনা। রেটিনায় রড ও কোণকোষ নামক দুধরনের আলো সংবেদী কোষ থাকে। রেটিনাতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। কোণকোষগুলো তীব্র আলোতে ও রডকোষগুলো অল্প আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।

৯. দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেনসরি লিগামেন্টের সঙ্কোচন-প্রসারণে ও লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাকে উপযোজন বলে। চোখ থেকে ৬ মিটার দূরত্বে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিফলিত বা ফোকাস হয়। এ দূরত্বের কম বা বেশি হলে উপযোজনের প্রয়োজন হয়।

১০. মানুষ দ্বিনেত্র দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাণী। অর্থাৎ মানুষ দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে এককভাবে দেখে। এ ধরনের দর্শনকে স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি বলে।

১১. নিশাচর প্রাণিদেহে চোখে রডকোষের সংখ্যা বেশি থাকায় অন্ধকারেও দেখতে পায়। তবে কোণকোষের সংখ্যা কম থাকায় লাল, নীল, হলুদ সবুজ ইত্যাদি রং দেখতে পায় না।

১২. কান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ।

১৩. মধ্যকর্ণের গহ্বরের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত সরু নালিকে ইউস্টেশিয়ান নালি বলে। এটি কর্ণপটহের দুপাশের বায়ু চাপের সমতা বজায় রাখে।

১৪. মধ্যকর্ণে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামক তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি শিকলের মতো বিনস্ত থাকে, এদের কর্ণাস্থি বলে। এগুলো মানবদেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি। কর্ণাস্থির মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ কর্ণপটহ থেকে অন্তঃকর্ণে পরিবাহিত হয়।

১৫. অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিস্থ বলে। এটি শ্রবণ অঙ্গ ও ভারসাম্য অঙ্গ নিয়ে গঠিত।

১৬. অন্তঃকর্ণ বা মেমব্রেনাস ল্যাবিরিস্থ ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস নামক দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস ৩টি অর্ধবৃত্তাকার নালি নিয়ে গঠিত। এটি দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। স্যাকুলাস নলাকার প্রকোষ্ঠ। এর অঙ্কীয়দেশে ককলিয়া নামক শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো নালিকা থাকে। ককলিয়ায় শ্রবণ অঙ্গ অরগ্যান অব কর্টি অবস্থিত।

১৭. হরমোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা কোনো কোষগুচ্ছ থেকে ক্ষরিত হয়ে রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ বা কোষগুচ্ছসমূহকে প্রভাবিত করে।

১৮. পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকারিতা এতই ব্যাপক যে, এটি প্রায় সকল গ্রন্থির কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ কারণে পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রন্থির রাজা বা মাস্টার গ্ল্যান্ড বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চোখের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি যোগায় কোনটি ?
ক কর্ণিয়া খ রেটিনা গ স্ক্লেরা ঘ কোরয়েড

২. নিচের কোনটি নিউরাল নালির প্রাচীরে দেখা যায় ?
ক আবরণী কোষ খ সিলীয় কোষ
গ স্নায়ু কোষ ঘ পেশ কোষ

৩. স্নায়ু কোষের প্রলম্বিত অংশ কয় প্রকার ?
ক ৪ খ ৮ গ ৬ ঘ ২

৪. অষ্টম করোটিকা স্নায়ুর কাজ–
ক মস্তিষ্কে দর্শন অনুভূতি পৌছানো
খ ঘ্রাণানুভূতি মস্তিষ্কে পরিবহন
গ শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা
ঘ চক্ষুপেশি সঞ্চালন

৫. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে ?
ক সেরেব্রাম খ) হাইপোথ্যালামাস
গ সেরেবেলাম ঘ) থ্যালামাস

৬. ককলিয়া কয়টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ ছয়

৭. নিয়োগ্লুকোজেনেসিস প্রতিরোধ করে--
ক সোমাটোস্টাটিন খ গ্যাস্ট্রিন
গ ইনসুলিন ঘ গ্লুকাগন

৮. ভেগাস স্নায়ু–
i. মিশ্র প্রকৃতির ii. মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন
iii. ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. হরমোনের বৈশিষ্ট্য–
i. স্টেরয়েড ii. প্রোটিনধর্মী iii. ফেনলিক
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ–
i. করোটিক স্নায়ু ii. সুষুম্নাকান্ড iii. মস্তিষ্ক
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. জিহ্বার সঞ্চালন কোন স্নায়ুর কাজ–
i. হাইপোগ্লোসাল ii. গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল
iii. ফেসিয়াল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে যথাক্রমে–
i. টিম্পেনিক পর্দা ii. ককলিয়া iii. ভেস্টিবুলার অর্গ্যান
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. অ্যাম্পুলার মধ্যে থাকে–
i. সংবেদী কোষ ii. রোম iii. মোম গ্রন্থি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের চিত্র হতে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

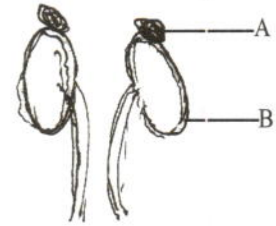

১৪. "A" চিহ্নিত অংশটির নাম কী ?
ক পিটুইটারি গ্রন্থি খ পিনিয়াল গ্রন্থি
গ থাইমাস গ্রন্থি ঘ অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি

১৫. উদ্দীপকের "B" চিহ্নিত অঙ্গটির কাজ–
i. রক্ত থেকে রেচন পদার্থ পৃথকীকরণ
ii. মূত্র উৎপাদন iii. পুনঃশোষণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. ক
৬. খ	৭. গ	৮. খ	৯. ঘ	১০. গ
১১. ক	১২. গ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাতুল ক্লাসে বসে পড়ছিল। হঠাৎ টিফিনের সময় ক্লাসের বাইরে এসে সূর্যের দিকে তাকাতেই তার চোখ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। একটু পরে আবার ক্লাসে ঢুকলে অল্পক্ষণের মধ্যে তার চোখ ঠিক হয়ে গেল।
ক) হরমোন কী ? ১
খ) অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখাও। ২
গ) উদ্দীপকে রাতুলের চোখ সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে যে সংবেদী অঙ্গের কথা হয়েছে ঐ অঙ্গের যে অংশে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা দাও। ৪